মাসুদ রানা

কর্কটের বিষ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7635-4

কর্কটের বিষ

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

হিংস্র কোন বন্য পশুকে টার্গেট করলে এই শিকারীর হাত থেকে তার আর রেহাই নেই। জিম্বাবুয়েতেই জন্ম, ত্রিশ বছর ধরে চারশো বর্গমাইল বনভূমি চষে বেড়াচ্ছে; না কাউকে ভয় পায়, না কোন আইন মানে, দয়া-মায়াহীন নির্দয় পাষণ্ড বললেই চলে। জাম্বেজি নদীর কিনারা থেকে পাঁচশো মিটার দূরে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা উঁচু পাথরে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসে আছে। লোকটা শ্বেতাঙ্গ, কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পেস্ট মেখে হাত আর মুখ কালো করে নিয়েছে। পায়ে কালো বুট, পরনে কালচে-সবুজ ট্রাউজার, গায়ে ছাই রঙের শার্ট। তার বাম দিকে, জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নদীর দিকে নামছে এক পাল ইম্পালা হরিণ, সূর্য ডোবার আগে পানি খাবে–বড়দের চারপাশে চক্কর দিয়ে লাফালাফি করছে বাচ্চাগুলো। ডান দিকে একজোড়া জেব্রা, একইদিকে যাচ্ছে; ওগুলোর পিছনে নিঃসঙ্গ এক মর্দা কুডু হরিণ, শাখা-প্রশাখা গজানো বাঁকা শিংগুলোর নিচে কাঠামোটাকে স্ট্যাচুর মত লাগছে দেখতে। এ-সব লক্ষ করলেও, এদিকে শিকারীর কোন আগ্রহ নেই। লেপার্ড ও চিতা ছাড়া অন্য কোন পশু শিকার করে এখন আর সে মজা পায় না। একঘেয়ে লাগে। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্যে মানুষ শিকারের সুযোগ খোঁজে সে। আশায় আশায় থাকে, বেয়াড়া কোন বনরক্ষী তাকে চ্যালেঞ্জ করবে; কিংবা কোন পোচার বা ছিঁচকে চোর তাদের সুরক্ষিত প্রাসাদে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা চালাবে। গত আড়াই বছরে মাত্র ছ'জন মানুষকে শিকার করার সুযোগ পাওয়া গেছে, তাতে তার মন ভরেনি, বরং নেশা বেড়েছে। তার বাবা ছেলের এই নেশা সম্পর্কে সচেতন, তবে প্রয়োজন ছাড়া মানুষ খুন করে কোটি ডলারের ব্যবসাটাকে ছেলে ঝুঁকির মধ্যে ফেলুক তা সে সমর্থন করতে পারে না। ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলেই শুধু ছেলেকে এই তৃষ্ণা মেটাবার অনুমতি দেয়।

বাবার নির্দেশেই আজ এখানে হাজির হয়েছে শিকারী। এই মুহূর্তে তাকিয়ে রয়েছে বড় একটা খাকি তাঁবুর দিকে। তাঁবুটা প্রকাণ্ড এক বেওব্যাব গাছের ছায়ায়। চোখ তুলে আবার একবার ডান দিকে দৃষ্টি বোলাল সে। লাল সূর্য ডুবতে আর বেশি সময় নেবে না। সে চাইছে, রাতটা যেন এখানে কাটাতে না হয়। তবে কোন প্রার্থনা করছে না। ধর্মকর্ম বা ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। বাবা তাকে শিখিয়েছে, টাকাই ক্ষমতা, আর ক্ষমতা থাকলে তুমিই ঈশ্বর।

রাইফেলটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। পুরানো একটা এনফিল্ড এনভয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্নাইপারদের খুব প্রিয় ছিল। সঙ্গে বত্রিশ-এক্স টেলিস্কোপ আছে। এই অস্ত্রটা ছোট বেলা থেকেই নাড়াচাড়া করছে শিকারী।

তাঁবুর ফ্ল্যাপ নড়ে ওঠায় আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। বাইরে বেরুল সুদর্শন এক

তরুণ; রোগা-পাতলা একহারা গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামলা, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। তরুণের মাথায় এক রাশ কালো চুল। পরনে শুধুই সবুজ শর্টস। আগুনটায় কোন শিখা নেই, সাদা ধোঁয়া মোচড় খেতে খেতে ওপরে উঠছে। পা দিয়ে ঠেলে আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলল তরুণ।

রাইফেলে হাত দিল শিকারী। পকেটে যুবকের ফটো আছে, স্কোপে চোখ রেখে ফটোর সঙ্গে তরুণের চেহারা মিলিয়ে নিল। কালো চুল হ্যাটে ঢাকা পড়লেও, চেহারা অবিকল এক।

পজিশন নিল শিকারী। একটা পাথরে হেলান দিল, কনুই রাখল ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর। অকস্মাৎ আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল সে অস্পষ্ট নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে। স্কোপ থেকে চোখ সরাল। তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। সে-ও সবুজ শর্টস পরে আছে, বুকে ব্রেসিয়ার ছাড়া নাভির ওপর আর কিছু নেই। স্কোপে চোখ রেখে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখল শিকারী। মেয়েটি শ্বেতাঙ্গ, রোদে পোড়া মুখের দু'পাশ থেকে দীর্ঘ সোনালি চুল নেমে এসেছে, এতই লম্বা যে সবুজ শর্টস প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসছে সে।

মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল শিকারী। তাকে বলা হয়েছে তাঁবুতে লোকটা একাই থাকবে। দিগন্তের কাছে লটকে থাকা সূর্যটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। এখন আর রেডিও অন করে নতুন নির্দেশ চাওয়ার সময় নেই হাতে। রেডিও রয়েছে মাইলখানেক পিছনে ঝোপের ধারে লুকিয়ে রাখা ল্যান্ড-রোভারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল শিকারী।

আগুনটার পাশে উবু হয়ে বসে আছে তরুণ, একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটাকে জ্যান্ত করছে। পাশে মেয়েটা দাঁড়ানো, ঠোঁটে মুগ্ধ-বিস্ময় মেশানো হাসি, দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে চঞ্চল ইম্পালা হরিণের দলটা। শিকারী তাকেই প্রথম গুলি করল, দুই স্তনের ঠিক মাঝখানে। পরমুহূর্তেই ছুটল দ্বিতীয় বুলেট। তরুণ ইতিমধ্যে সিধে হতে শুরু করেছে। পেটে গুলি খেলো সে। মেয়েটি নিঃসাড় শুয়ে আছে। তরুণ গড়াগড়ি খাচ্ছে, দু'হাতে পেট চেপে ধরে। শিকারী আরেকটা গুলি করে তার মাথা ফুটো করে দিল। মেয়েটিকে আর গুলি করল না। বুলেট অপচয় করার লোক নয় সে।

পেশায় মেডিসিন স্পেশালিস্ট অর্থাৎ ডাক্তার হলেও, খোদাবক্স মৃধা প্র্যাকটিস করেন না। কর্মজীবনের ত্রিশটা বছর ওয়াশিংটনে কাটিয়েছেন, ওখানকার একটা নামকরা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বছর দেড়েক হলো সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র একটা স্পেশাল প্রজেক্ট-এর ডিরেক্টর হয়ে জিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারারেতে চলে এসেছেন গণ্ডারের শিং নিয়ে গবেষণা করার জন্যে। বয়স প্রায় ষাট, চিরকুমার, একটু খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ তিনি। জন্মভূমি অর্থাৎ বাংলাদেশে নিকট-আত্মীয় তেমন কেউ নেই, তাই দুই যুগের বেশি হয়ে গেল দেশমুখো হননি। দেশকে তিনি খুবই ভালবাসেন, তবে তার দেশপ্রেম একটু অন্যরকম। সারা জীবন অধ্যাপনা ও বিভিন্ন প্রকল্পে গবেষণা করে প্রচুর আয় করেছেন, কিন্তু খরচ করেছেন টিপে টিপে। তাঁর কোন নেশা নেই, বিলাসিতাও

পছন্দ করেন না। নিজের কাজ নিজেই করেন, এমনকি রান্না ও কাপড় ধোয়ার জন্যেও কোন চাকরবাকর রাখেন না। বন্ধু মহলে কৃপণ হিসেবে পরিচিত। কাউকে কোনদিন বলেননি, রোজগারের বেশিরভাগ টাকাই ভদ্রলোক একটা সুইস ব্যাংকে জমা করেছেন বাংলাদেশে বড়সড় একটা হাসপাতাল তৈরি করার উদ্দেশ্যে। দেশে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সহযোগিতায় ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুরে হাসপাতালের জন্যে জমি কেনাও হয়ে গেছে। হু-র এই গবেষণা প্রকল্প শেষ হতে আর মাস তিনেক বাকি, তারপরই দেশে ফিরে হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কাজে হাত দেবেন।

তাঁর ল্যাবরেটরি সরকারী ক্যান্সার হাসপাতালের কাছাকাছি, শহরের উপকণ্ঠে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাইওয়ান আর হংকং থেকে কয়েকজন ধনকুবের চীনা ক্যান্সার রোগীকে জিম্বাবুইয়ে আনিয়েছেন তিনি গবেষণার স্বার্থে। ল্যাবরেটরি থেকে প্রায়ই ওই রোগীদের দেখার জন্যে হাসপাতালে যেতে হয় তাঁকে। কাল রাতেও ল্যাবরেটরির কাজ সেরে যেতে হয়েছিল। রোগীদের পরীক্ষা করে ফ্ল্যাটে ফিরতে তাই অনেক রাত হয়ে যায়।

আজ সকাল সাড়ে সাতটায় ঘড়ির অ্যালার্ম ঠিক সময়েই বাজল, কিন্তু তাঁর ঘুম ভাঙল না। ভাঙল আরও এক ঘণ্টা পর, সাড়ে আটটায়, টেলিফোনের শব্দে। চোখে ঘুম রয়েছে এখনও, বিছানা না ছেড়েই খাটের পাশের টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। অপরপ্রান্ত থেকে মেট্রোপলিটান পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, 'ডক্টর খোদাবক্স মৃধা?'

'হ্যাঁ, বলছি। কি ব্যাপার, ইন্সপেক্টর?'

'স্যার, আপনাকে এখুনি আপনার ল্যাবরেটরিতে আসতে হবে। ভোর রাতে দু'জন দারোয়ান খুন হয়ে গেছে।'

ঝট্ করে উঠে বসলেন ডক্টর মৃধা। 'হোয়াট! কি বলছেন আপনি!'

'ওদেরকে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে, ডক্টর মৃধা,' ইন্সপেক্টর বলল। 'একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। দ্বিতীয় লোকটা এই একটু আগে হাসপাতালে মারা গেছে।'

'কিন্তু কেন ওরা খুন হবে? ল্যাবরেটরিতে এমন দামী কিছু তো নেই যে...'

'দুঃখিত, ডক্টর মৃধা। তদন্ত না করে মোটিভ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না,' বলল ইন্সপেক্টর। 'দ্বিতীয় দারোয়ান মারা যাবার আগে জবানবন্দী দিয়ে গেছে। তেমন কিছুই সে বলতে পারেনি, শুধু বলেছে খুনী একজন শ্বেতাঙ্গ, একাই এসেছিল।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ডক্টর মৃধা জানতে চাইলেন, 'ল্যাবরেটরির কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'ক্ষতি হয়নি মানে? আপনার ল্যাবরেটরি নেই, ডক্টর মৃধা। ল্যাবের সব ক'টা কামরায় পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যন্ত্রপাতি, কাগজ-পত্র, কমপিউটর, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

ডক্টর মৃধার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। ইন্সপেক্টর আরও অনেক কথা বলে

যাচ্ছেন, কিন্তু সে-সব কিছুই তাঁর কানে ঢুকছে না। দেড় বছরের গবেষণার ফল ল্যাবের ফাইল আর কমপিউটরেই শুধু ছিল, অন্য কোথাও পাঠানো হয়নি। ওগুলো যদি সব পুড়ে গিয়ে থাকে, এতদিনের কঠোর সাধনা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে তাঁকে। তারপর মনে পড়ল, গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল কি পেতে যাচ্ছেন, এ-সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাইপো সাইফুরকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন।

'এখুনি আসছি আমি,' বলে রিসিভার ক্রেডলে রেখে লাফ দিয়ে খাট থেকে নামলেন ডক্টর মৃধা। বাথরুমে যাবার তাগাদা অনুভব করলেন, কিন্তু সময় নষ্ট হবে ভেবে গেলেন না। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটলেন গ্যারেজের দিকে।

তাঁর গাড়ি পুরানো মডেলের একটা কালো মরিস। গ্যারেজের সামনে এসে দেখেন, তালা খোলা। মনে মনে বিস্মিত হলেও, নিজেকে ব্যাখ্যা দিলেন এই বলে যে কাল রাতে দেরি করে ফিরেছেন, তাড়াহুড়া করায় তালা লাগাবার কথা সম্ভবত মনে ছিল না। গ্যারেজের দরজা খুলে গাড়িতে উঠলেন। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলেন এঞ্জিন। বিস্ফোরণটা গোটা এলাকা কাঁপিয়ে দিল। চোখের পলকে গ্যারেজটা উড়ে গেল, মরিসটা পরিণত হলো লোহা আর ইস্পাতের সহস্র টুকরোয়, একমাত্র আরোহীর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কি ঘটল, কেন ঘটল, এ-সব কিছুই জানার সুযোগ পেলেন না খোদাবক্স মৃধা।

এক মাস পরের ঘটনা। ওয়াশিংটন ডি.সি।

ফাইলটা নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স, লিভিংরুম পেরিয়ে মায়ের বেডরুমের দিকে এগোল। নক করতে ভেতর থেকে প্রায় কর্কশ, পুরুষালি গলা ভেসে এল, 'দরজা খোলা আছে।'

হুইলচেয়ারে বসে খোলা জানালা দিয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স। ষাট চলছে, কিন্তু গত চার হপ্তায় শোক আর বেদনা তাঁর বয়েস যেন দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। লরেলির পায়ের আওয়াজ হুইলচেয়ারের পিছনে এসে থামল, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তিনি তাকালেন না। 'কেন এসেছিল ওরা?' জিজ্ঞেস করলেন। শিকারী পাখির মত আঙুল দিয়ে হুইলচেয়ারের হাতল দুটো আঁকড়ে ধরলেন।

'জিম্বাবুই পুলিসের ফাইনাল রিপোর্টটা আমাদের হারারে এমব্যাসী হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে,' ম্লানকণ্ঠে বলল লরেলি। 'সেটাই ওরা পৌঁছে দিয়ে গেল। রিপোর্টটা তুমি পড়বে, মা?'

'না,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন ফেয়ারলি। 'ডিটেইলস জেনে লাভ কি। রিপোর্টে নতুন কিছু আছে?'

একটা চেয়ার টেনে এনে মায়ের পাশে বসল লরেলি। তাকেও খুব ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে। 'না, মা, নতুন কিছু নেই। পুলিস কোন সূত্র খুঁজে পায়নি। মোটিভও জানা যায়নি। ডাকাতি নয়, রেপ নয়। জাম্বেজি নদীর কাছাকাছি ওই সাইটে জেসিকা আর তার বয়ফ্রেন্ড ক্যাম্প ফেলেছিল। ওখানে তিনদিন ছিল

ওরা। পুলিস বলছে, এ-ও সম্ভব নয় যে হঠাৎ ওদেরকে দেখে একদল পোচার বনরক্ষী বলে ভুল করবে।'

হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে মেয়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ফেয়ারলি। 'সার কথা, মার্কিন প্রশাসনের চাপেও কোন কাজ হয়নি, এই তো? বেশ, ভাল কথা। কিন্তু আমাকে তুই ভাল করেই চিনিস, লরেলি। তোর মা এত সহজে হার মানার পাত্রী নয়। জেসিকাকে যে বা যারাই খুন করে থাকুক, আমি দেখতে চাই তাদের কঠিন শাস্তি হয়েছে।'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি, মা,' বলল লরেলি। 'না এদিক থেকে, না ওদিক থেকে। জিম্বাবুই সরকারকে আমেরিকা প্রতি বছর প্রচুর ডলার সাহায্য দিচ্ছে। ওদের প্রেসিডেন্ট নিজে পুলিস চীফকে ডেকে কড়া নির্দেশ দেন, তদন্তে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। আমাদের হারারে অ্যামব্যাসাডরও সব কাজ ফেলে এই কেসটায় সময় দিয়েছেন।'

ফেয়ারলির দৃষ্টি আরও কঠিন হলো। 'বুঝলাম। সবাই তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। কিন্তু, লরেলি, আমার কাজ এখনও শুরুই হয়নি।'

মায়ের দিকে একটু ভয়ে ভয়েই তাকাল লরেলি। তিন বছর আগে কার অ্যাক্সিডেন্টে তার বাবা জন মর্টন ভ্যান্স মারা যান। স্বামীর সঙ্গেই গাড়িতে ছিলেন ফেয়ারলি, কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও কোমর থেকে নিচের অংশ প্যারালাইজড হয়ে যায়, সেই থেকে হুইলচেয়ার নিয়ে চলাফেরা করতে হয় তাঁকে। মর্টন ভ্যান্স একশো মিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা রেখে গিয়েছিলেন, তিনি মারা যাবার পর বড় মেয়ে লরেলি রাজনীতি ছেড়ে বাবার ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। দুই বোন ওরা, ছোটবোন জেসিকার বয়স তখন মাত্র একুশ, পড়াশোনা করছিল। অগত্যা বাধ্য হয়েই স্বামীর ব্যবসা নিজে দেখাশোনা করার সিদ্ধান্ত নেন ফেয়ারলি। পরবর্তী আড়াই বছরে দেখা গেল মর্টন ভ্যান্সের রেখে যাওয়া ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী মহলে তাঁর কৌশল আর বুদ্ধির প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। তবে একই সঙ্গে ছড়াল কুখ্যাতি—ভদ্রমহিলা অসম্ভব জেদী, সাংঘাতিক রগচটা, কেউ তাঁকে ঠকিয়েছে বুঝতে পারলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না। 'তোমার কাজ শুরু হয়নি মানে?' নিস্তব্ধতা ভেঙে অবশেষে জানতে চাইল লরেলি।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, লরেলি,' মিসেস ভ্যান্স শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। 'ওখানে আমি নিজের লোক পাঠাব। তারা জেসিকার খুনীকে খুঁজে বের করবে।' ডান হাত তুলে তাতে কাশলেন, কাগজ ছেঁড়ার মত আওয়াজ হলো। 'ওরা সবাই নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, লরেলি। প্রফেশনাল। তোর মামা একটা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে।'

'এজেন্সির লোক? মার্সেনারি?' হকচকিয়ে গেছে লরেলি।

'ওদের বিরুদ্ধে লেকচার দিবি না,' মেয়েকে সাবধান করে দিলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ওরা কেমন লোক, তা জেনে আমার কোনও দরকার নেই। আমার কাজ নিয়ে কথা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরেলি। 'মা, প্রথমে আমার সঙ্গে তোমার আলোচনা

করা উচিত ছিল। মার্সেনারিদের সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। তুমি কি জানো, আফ্রিকা সম্পর্কে আমেরিকান মার্সেনারিরা একেবারেই অনভিজ্ঞ? পুরো টাকাটাই তোমার পানিতে যাবে। তাছাড়া, একটু ধৈর্য ধরতে পারলে না? আমার একমাত্র বোন খুন হয়ে গেছে, আর তুমি ভেবে নিয়েছ আমি চুপ করে বসে আছি?'

মেয়ের দিক ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিসেস ভ্যান্স। 'কিছু যদি করছিসই, আমাকে জানাসনি কেন?'

'আমি তো আর যার-তার কাছে সাহায্য চাইতে পারি না,' বলল লরেলি। 'এ কাজের জন্যে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ লোক মাত্র একজনকেই চিনি আমি। কিন্তু সে খুব ব্যস্ত মানুষ, ডাকলেই তাকে পাওয়া যায় না। খবর দিয়েছি, আশা করছি যে-কোন দিন ওয়াশিংটনে পৌঁছে যাবে সে।'

'সে কি মার্সেনারি?'

মাথা ঝাঁকাল লরেলি। 'মার্সেনারিরা তার নেতৃত্বে কাজ করে, মা।'

'আফ্রিকা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে?'

'তুমি যেমন তোমার হাতের উল্টোপিঠ চেনো, সে-ও তেমনি আফ্রিকাকে চেনে।' আবার মাথা ঝাঁকাল লরেলি।

'কি নাম তার?'

'মাসুদ রানা।'

মিসেস ভ্যান্সের চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটল। কিছু বলতে যাবেন, লরেলির ভুরু দুটো কুঁচকে উঠছে দেখে নিজেকে সামলে নিলেন। শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'ওহ্।'

'সে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল লরেলি। 'সে আমার চেয়ে বয়েসে দু'এক বছরের ছোট হলেও, আমি তাকে সমীহ আর শ্রদ্ধা করি। আরও একটু বলি, তোমার মেয়ে কংগ্রেস সদস্য হলেও, মাসুদ রানাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তার মর্যাদা বরং আরও বেড়েছে। এই সম্পর্কটার জন্যে আমি গর্বিত। কাজেই, তার সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে একটু সামলে রেখো। তোমার মেজাজটাকে সত্যি আমি ভয় পাই।'

অভয় দিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে যতই প্রশংসা করো, একটু বাজিয়ে না দেখে টাকা খরচ করতে আমি রাজি নই, তুইও এই কথাটা মনে রাখিস।'

লরেলিকে অসহায় দেখাল। 'টাকা? মা, সাবধান! টাকার কথা ভুলেও ওর সামনে তুলো না।'

'কেন?'

'কাজটা যদি করে দিতে রাজি হয়, কোন টাকাই সে নেবে না,' বলল লরেলি। 'টাকার কথা বললে অপমানিত বোধ করবে। আমি তাকে বহু বছর ধরে চিনি, মা। তুমি বরং চুপ করে থেকো, যা বলার আমিই বলব।'

'আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে, লরেলি।' মিসেস ভ্যান্সের চেহারায় বিরক্তি। 'যার টাকার লোভ নেই, সে কোন কাজের লোকই নয়।'

'বন্ধুত্বের খাতিরে যারা আত্মত্যাগ করে, তারা তাহলে কি?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'হয় বোকা, তা না হলে অযোগ্য,' রায় দিলেন মিসেস ভ্যান্স।

'তোমার ধারণা ভুল,' বলল লরেলি। 'অপেক্ষা করো, রানা সেটা প্রমাণ করবে।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক।'

রানাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিজের ক্যাডিলাকে তুলে নিল লরেলি। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে ওরা, তবে তেমন কোন কথা হয়নি। লরেলির চোখ ছলছল করছে দেখে রানা তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে শুধু বলেছে, 'সত্যি আমি কষ্ট পেয়েছি।'

লরেলি নিজেই ড্রাইভ করছে, পাশে বসে আছে রানা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'কষ্ট পেয়েছি, অবাকও হয়েছি। জেসিকাকে আমি কখনও দেখিনি, শুধু ফটো দেখেছি তোমার বেডরুমে। অবাক হয়েছি এই জন্যে যে তোমার বোন খুন হয়ে গেল, আর আমি সেটা জানতে পারলাম এক মাস পর?'

'তোমার সাহায্য দরকার হবে, এটা তখন ভাবতেই পারিনি আমি,' বলল লরেলি। 'কাদের তরফ থেকে কি ধরনের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল আমাকে, শুনলে বুঝতে পারবে কেন এতদিন অপেক্ষা করেছি। আমাদের অ্যামব্যাসাডরের মাধ্যমে জিম্বাবুইয়ের প্রেসিডেন্ট নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, খুনী যে-ই হোক, অবশ্যই তাকে ধরে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। প্রতিদিন আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, দ্রুতগতিতে তদন্ত এগোচ্ছে, যে-কোন দিন খুনী বা খুনীরা ধরা পড়বে। তিন হপ্তা পর প্রথম জানতে পারলাম, জিম্বাবুই পুলিস কোন সূত্রই পাচ্ছে না। তারপরই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করি। ফাইনাল রিপোর্টটা কাল পেয়েছি, গাড়িতেই আছে ফাইল...'

'ঢাকা থেকে রওনা হয়ে প্রথমে আমি হারারেতে যাই,' বলল রানা। 'ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা ছিলাম। ওদের ফাইনাল রিপোর্টের একটা কপি আমার কাছেও আছে।'

'তাহলে তো সবই তুমি জানো।'

সঙ্গে সঙ্গে নয়, কয়েক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'সবাই যা জানে, তারচেয়ে বেশি জানি আমি। তবে এ-ধরনের কেসে সময় হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী ফ্যাক্টর। অনেক দেরি হয়ে গেছে, লরেলি।'

'এর মানে কি কাজটা হাতে নেবে কিনা তাই নিয়ে দ্বিধা বোধ করছ?' সরাসরি জানতে চাইল লরেলি।

'ওহ্ গড, তোমার ধারণা কেসটা এখনও নিইনি আমি?' ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'আমি খবর পাওয়ার পরপরই রানা এজেন্সির এজেন্টরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দেয়, তা জানো?'

'কি বলছ তুমি!' লরেলির চোখে অবিশ্বাস।

'জিম্বাবুই পুলিস কোন সূত্র পায়নি, তাই না? অথচ আমার হাতে এত সূত্র, বুঝে উঠতে পারছি না কোনটা ধরে এগোব।'

'শুনে মা যা খুশি হবে না!' এই প্রথম একটু হাসল লরেলি। 'শোনো, রানা, আমার মা সম্পর্কে তোমাকে আগেই একটু সাবধান করে দিই। পঙ্গু মানুষ তো, মেজাজটা...'

'ছিহ্, লরেলি। এ-সব নিয়ে কোন কথা নয়, প্লীজ।'

'না, বলছিলাম কি...'

'কোন প্রয়োজন নেই, লরেলি। হুইলচেয়ারে বসা মানুষ আগেও আমি দেখেছি। বিশ্বাস করো, আমার কোন সমস্যা হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল লরেলি।

চেহারা একটা বিরাট সার্টিফিকেট, তার সঙ্গে যদি মানানসই ও রুচিসম্মত পোশাক থাকে, জানা থাকে অভিজাত মহলে প্রচলিত আদব-কায়দা, মানুষের মনে অনুকূল ছাপ ফেলা কোন সমস্যা হয় না। লরেলির লিভিং রুমে ঢুকে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে, সসম্মানে মিসেস ভ্যান্সের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, তারপর ঝুঁকে তাঁর হস্তচুম্বন করল, অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে নরম সুরে বলল, 'আই য়্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস, মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স।'

সব মিলিয়ে রানাকে ভাল লেগে গেল বৃদ্ধার, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নিজের স্বভাব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। ইঙ্গিতে একটা সেটি দেখিয়ে রানাকে বসতে বললেন, পরমুহূর্তে সরাসরি জানতে চাইলেন, 'আমি কি চাই, লরেলি কি তা তোমাকে জানিয়েছে?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন না। 'আমি চাই খুনী ধরা পড়ুক, এবং তাদের শাস্তি হোক। শাস্তি প্রসঙ্গে বলতে চাই, জিম্বাবুই পুলিসের প্রতি আমার কোন আস্থা নেই। ওদের আইনেরও আমি এক পয়সা দাম দিই না। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। খুনের বদলে...'

একটা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, মিসেস ভ্যান্স। আপনি কি চান আমি বুঝতে পারছি।'

'তাহলে পরিষ্কার করে বলো, কাজটা তুমি পারবে? কেসটা নিচ্ছ?'

'আমাকে একটু বিস্তারিত বলতে হয়, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'আমার এজেন্সি ইনভেস্টিগেশন শুরু করার পর জানতে পেরেছে খুন দুটো নয়, তিনটে হয়েছে। সাইফুর রহমান মৃধা আর জেসিকা খুন হয়েছে জাম্বেজি নদীর কাছে, ওদিকে হারারেতে খুন হয়েছেন সাইফুর রহমানের চাচা ডক্টর খোদাবক্স মৃধা। দুটো ঘটনা, একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক আছে। জেসিকার জন্যে তো বটেই, তারপর যখন জানলাম যে ডক্টর খোদাবক্স আর তাঁর ভাইপো জুলজিস্ট রহমান বাঙালী ছিলেন, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম এই কেস আমাকে নিতেই হবে।'

'আমি আমার প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেলাম,' মিসেস ভ্যান্সের গলা এমনিতেই কর্কশ, অভিযোগের সুর থাকায় প্রায় রূঢ় শোনাল।

'আমি শুধু চেষ্টা করে দেখতে পারি, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'সফল হবই, এমন কথা বলতে পারি না। লরেলি আমাকে খবর দিতে দেরি করে

ফেলেছে। আমাদের আরও দুর্ভাগ্য, ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত ট্র্যাক মুছে গেছে। জিম্বাবুইয়ের জঙ্গলে এক হাজার বা তারও বেশি লোক রোজ অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজেদের স্বার্থে পরস্পরের অপরাধ চেপে রাখে তারা। এই অবস্থায় আপনাকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, যুক্তিটা আমি বুঝতে পারছি,' বৃদ্ধা বললেন। 'পরবর্তী প্রসঙ্গ। দু'দিন আগে লরেলির মামা একটা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওই এজেন্সির দু'জন লোক আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। কেসটার কথা শুনে আংশিক ফি হিসেবে আমার কাছে তিন লাখ ডলার অগ্রিম চেয়েছে তারা।'

'মা!' প্রতিবাদের সুরে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল লরেলি, হাত তুলে রানা তাকে থামিয়ে দিল।

'মিসেস ভ্যান্স, এই কেসে আপনাকে কোন ফি দিতে হবে না।'

'আচ্ছা! তা বেশ।' আড়চোখে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন মিসেস ভ্যান্স। 'আরেকটা প্রসঙ্গ। অপরাধী ধরা না পড়া পর্যন্ত ব্যবসার কাজে আমি ফিরে যেতে পারব না। অস্থিরতা দূর করার জন্যে আমারও কিছু একটা করা দরকার। আমি যদি তোমার সঙ্গে জিম্বাবুইয়ে যাই, তোমার অসুবিধে হবে?'

'মা, কেসটা অত্যন্ত বিপজ্জনক,' তাড়াতাড়ি বলল লরেলি। 'রানাকে যদি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, ওর কাজে বিঘ্ন ঘটবে।'

'প্রশ্নটা রানাকে করা হয়েছে, সে-ই উত্তর দিক। আমি হারারেতে থাকব, ওর সঙ্গে জঙ্গলে ঢুকব না।'

'রানা এজেন্সির আফ্রিকান চীফ মামুন থাকবে ওখানে,' বলল রানা। 'অত্যন্ত যোগ্য ছেলে, আমি নিজের হাতে তাকে ট্রেনিং দিয়েছি। আপনি হারারেতে থাকলে কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না, মামুন আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখবে।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ভ্যান্স। এই প্রথম সরাসরি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন, যেন বলতে চাইলেন রানাকে তাঁর অপছন্দ হয়নি।

খেতে বসে মিসেস ভ্যান্স জানতে চাইলেন আফ্রিকার উদ্দেশে কবে রওনা হচ্ছে রানা।

'কাল,' জবাব দিল রানা। 'ব্রাসেল্‌স্ হয়ে।'

'ব্রাসেলস হয়ে কেন?'

'ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, জিম্বাবুইয়ে যাবার আগে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। হারারেতে এক কি দু'দিন থাকব আমরা, তারপর বুলাওয়েওতে যাব। সব মিলিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা প্লেনে থাকতে হবে আমাদের।'

'বারবার প্লেন বদল করার দরকার কি,' মিসেস ভ্যান্স বললেন। 'আমি বরং একটা প্রাইভেট ইন্টারকন্টিনেন্টাল-রেঞ্জ জেট চার্টার করি, ককপিট ও কেবিন ক্রুসহ। নার্স সিলভিয়াও সঙ্গে যাবে, আমার দেখাশোনা করার জন্যে।' রানা বা লরেলি কিছু বলছে না দেখে আবার তিনি মুখ খুললেন, 'তাহলে সেই কথাই রইল। কাল সকাল দশটায় এয়ারপোর্টে যাচ্ছি আমরা।'

'এত সব আয়োজন এরইমধ্যে শেষ করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।
'কেন পারব না। এটা মার্কিন মুল্লুক, এখানে টাকা কথা বলে।'

নিচে আটলান্টিক, আকাশের পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে প্লেন। প্রাইভেট জেটটা অত্যাধুনিক গালফস্ট্রীম ফোর। কেবিনের ঠিক পিছনেই ক্রুদের কোয়ার্টার, তারপর গ্যালি ও সার্ভিস এরিয়া। ডাইনিং এরিয়া ও লাউঞ্জ পার হয়ে পিছনে যেতে হয়, ওখানে রয়েছে একটা স্যুইট কেবিন, দুটো সাধারণ কেবিন। প্রতিটি কেবিনে তিনটে করে বাঙ্ক আছে।

আকাশে থাকতেই জেরা শুরু করলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ব্রাসেলসে আমাদের প্রোগ্রাম কি?'

'ওখানে আমার বন্ধু লোটন নড্‌বেল আছে,' বলল রানা। লোটন নড্‌বেল সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণাও দিল। জিম্বাবুয়েই জন্ম তার, একজন মুক্তিযোদ্ধা। জিম্বাবুই স্বাধীন হবার পর আদর্শগত বিভক্তির কারণে মুক্তিযোদ্ধারা বহু বছর পরস্পরের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে মেতে ছিল, সেই সংঘর্ষে লোটন নড্‌বেল-এর পক্ষ নিয়ে রানাও লড়াই করেছে। ফ্রিডম ফাইটার নামে পরিচিত একটা সশস্ত্র সংগঠনের লীডার হিসেবে যে এলাকায় অপারেশন চালাত নড্‌বেল, ঘটনাচক্রে সেখানেই খুন হয়েছে জেসিকা আর সাইফুর রহমান। সেজন্যেই তার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। গৃহযুদ্ধ কোন সমাধান দিতে পারবে না, এই উপলব্ধি হওয়ায় দেশ ছেড়ে ব্রাসেলসে চলে এসেছে নড্‌বেল। ব্রাসেলাসে সে ব্যবসা করে। মার্সেনারিদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখে।

'তারমানে ওই লোটা ন্যাটবেল না কি যেন নাম, তার অভিজ্ঞতা ধার করবে তুমি?'

'আফ্রিকা সম্পর্কে আমার নিজের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে,' সবিনয়ে বলল রানা। 'যদিও আমি বেশিরভাগ সময় লড়াই করেছি মোজাম্বিক সীমান্তের কাছাকাছি। তবে একটা কথা স্বীকার করি, নড্‌বেলের তুলনায় আমার অভিজ্ঞতা কিছুই নয়। জিম্বাবুইয়ে আমার ভাল কন্ট্যাক্ট আছে, কিন্তু নড্‌বেলের কন্ট্যাক্ট আরও অনেক ভাল। জিম্বাবুইয়ে এখনও তার আত্মীয়স্বজন আছে। ওর নাম লোটন নড্‌বেল, মিসেস ভ্যান্স।'

'ব্রাসেলসে আর কি কাজ আমাদের?' জানতে চাইলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ওস্তাদ আর শিষ্য মিলে মাত্র দু'জন হলে। আমার তো ধারণা ছোটখাট একটা আর্মি ছাড়া জেসিকার খুনীদের ধরা সম্ভব নয়। কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দিই। টাকার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। প্রয়োজন মনে করলে যত বেশি সম্ভব মার্সেনারি ভাড়া করতে পারো তুমি।'

'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট বলে একটা কথা আছে, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'ব্রাসেলসে আমার জন্যে রানা এজেন্সির আফ্রিকান চীফ মামুন অপক্ষা করছে।'

'এই মামুন সম্পর্কেও আমার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার,' বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'কারণ, সেই তো আমার নিরাপত্তার দিকটা দেখবে, তাই না?'

মামুনের ইতিহাস রীতিমত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর। চুপচাপ ও শান্ত প্রকৃতির মেধাবি ছাত্র ছিল সে, ঢাকা ভার্সিটি থেকে ইংলিশে মাস্টার্স করার পর চাকরি না পেয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখছিল। রেজাল্ট বেরোবার পর হোস্টেলে থাকার অধিকার হারায়, কিন্তু ঢাকায় অন্য কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে বন্ধুদের পরামর্শে সীটটা দখল করে রাখে। গ্রামের বাড়িতে ফেরার কোন উপায় ছিল না, কারণ অশিক্ষিত সরল মায়ের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কোন ছেলের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। জননীকে মামুন কথা দিয়ে এসেছে, চাকরি পেলেই ঢাকায় বাড়ি ভাড়া নেবে, মাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখবে। মাসের পর মাস কাটে, বছর ঘুরে আসে, চাকরি আর হয় না। অন্যায়ভাবে আর যারা হোস্টেলের সীট দখল করে রেখেছে বেশিরভাগই তারা বহিরাগত সন্ত্রাসী, পুলিস হোস্টেলে হানা দিলে তাদের সঙ্গে মামুনকেও পাঁচিল টপকে পালাতে হয়, সঙ্গীরা হাতে বোমা গুঁজে দিলে পুলিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তেও হয় সেগুলো, কারণ এই সন্ত্রাসীরাই তার থাকা-খাওয়ার পয়সা যোগায়। এভাবেই হাতেখড়ি। তারপর ছোটখাট অপারেশনে যাবার ডাক পড়ল। হঠাৎ সবাই খেয়াল করল, মামুন নিজেও, ছিনতাই ও অপহরণের প্ল্যান এত নিখুঁতভাবে করতে পারে সে, ধরা পড়ার প্রায় কোন সম্ভাবনাই থাকে না। শুধু তাই নয়, যে-কোন অপারেশনে সবার আগে থাকে সে, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নেয়, নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরেও আসে সবার আগে। সন্ত্রাসীদের মধ্যে তার কদর বেড়ে গেল। সবাই তাকে 'গুরু' বলে ডাকতে শুরু করল। পুলিসের খাতায় টপ মাস্তানদের তালিকায় তার নামটা চলে এল সবার ওপরে। এরপর একের পর এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সব প্রস্তাব আসতে লাগল। রাজনৈতিক দল থেকে বলা হলো, আমাদের হয়ে কাজ করো, মাসে দু'চার লাখ টাকা নিয়ে যাও। ফেনসিডিল ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব দিল কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি করলে দশ লাখ টাকা কমিশন পাবে। এত টাকার লোভ সামলানো কঠিন, তার ওপর সন্ত্রাসী ভক্তদের চাপ তো আছেই। এক বছরে প্রচুর টাকা কামাল মামুন, অথচ ঢাকায় কোন বাড়ি ভাড়া নিল না, গ্রাম থেকে মাকে নিয়ে এসে নিজের কাছেও রাখল না।

এ-সব কথা অনেক পরে জেনেছে রানা। মামুনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় চরম সঙ্কটময় এক মুহূর্তে, জীবন-মৃত্যুর কিনারায় সে তখন ঝুলছে। বিসিআই হেডকোয়ার্টার মতিঝিল থেকে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় একটা কাজ নিয়ে বেরিয়েছে রানা, গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে শুনতে পেল রাস্তার ওপারে বোমা ফাটছে। সেদিকে তাকাতে বিশতলা বিল্ডিঙের নিচে লোকজনের ভিড় দেখতে পেল ও। বিল্ডিংটার নিচতলায় একটা ব্যাংক। লোকমুখে শুনল, একদল সন্ত্রাসী ব্যাংক লুঠ করতে এসে ধরা পড়েছে। সংখ্যায় ছিল ছয়জন, দু'জন পালিয়েছে, দু'জন গণপিটুনিতে মারা গেছে, একজন পালাতে না পেরে বিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেছে।

রাস্তা পেরিয়ে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল রানা, পুলিস ওর পরিচয় পেয়ে পথ আটকায়নি। তবে তারা ওকে সাবধান করে দিল, ছাদে কেউ উঠতে চেষ্টা করলেই বোমা ফাটাচ্ছে ছেলেটা, গুলি করারও হুমকি দিচ্ছে।

খোলা ছাদে একাই উঠল রানা। রেইলিংবিহীন ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে যাচ্ছিল মামুন, রানাকে দেখে হাতের রিভলবার তুলল গুলি করার জন্যে। তার লম্বা করা হাতটা কাঁপছে দেখে নরম সুরে হেসে উঠল রানা, বলল, 'আগে কখনও মানুষ মারোনি, এই প্রথম, তাই না?'

'কে আপনি?' রেগে গিয়ে জানতে চাইল মামুন।

'পরিচয় জেনে কি লাভ,' বলল রানা। 'উদ্দেশ্যটা বলি। আমি তোমাকে গণপিটুনি থেকে বাঁচাতে চাই। জানো নিশ্চয়ই, নিচে তোমার দুই সঙ্গীর লাশ পড়ে আছে?'

হাত কাঁপলেও, গলা কাঁপেনি মামুনের। 'ভয় দেখিয়ে কোন কাজ হবে না। যান, বিদায় হোন, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে।'

'পাবলিক খেপলে কি ঘটে, তোমার তো জানার কথা,' বলল রানা। 'খুব বেশি হলে আর দশ-পনেরো মিনিট লোকজনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে পুলিস।'

'উপদেশ দেবেন না। গা ঘিন ঘিন করে। যান, কেটে পড়ুন। আমি চাই না আমার সঙ্গে আর কেউ মারা যাক।'

'তুমি তাহলে গণপিটুনি খেয়ে মরতে চাইছ?' রানা বিস্মিত।

হেসে উঠে মাথা নাড়ল মামুন। 'আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন। শেষ একটা সিগারেট খেয়ে নিচে লাফ দেব আমি, আপনার পাবলিক বা পুলিস আমাকে জ্যান্ত ছুঁতে পারবে না।'

'কি আশ্চর্য, তোমার মত একটা কাপুরুষ ব্যাংক ডাকাতি করতে আসে কিভাবে?'

'কি বললেন?'

'আমার যা পেশা, প্রায়ই আমাকে তোমার মত কোণঠাসা অবস্থায় পড়তে হয়,' বলল রানা। 'আমি কিন্তু কখনোই কাপুরুষের মত আত্মহত্যার কথা ভাবি না। আমি সব সময় আত্মরক্ষার কথা ভাবি, এবং কোন না কোনভাবে উপায় একটা পেয়েও যাই।'

হাতের রিভলবারটা ফেলে দিল মামুন। 'মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছিলাম। ওটায় কোন গুলি নেই। সঙ্গে আর কোন বোমাও নেই। ধরুন, সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। এখন আমি নিচে লাফ দিতে চাই না। এবার বলুন, আমার বাঁচার উপায় কি?'

'দেখলে তো, সত্যি সত্যি মরার কোন ইচ্ছে তোমার নেই। কারণ, তুমি কাপুরুষ নও। আর কেউ যদি বাঁচতে চায়, নিয়তি বা প্রকৃতি ঠিকই তাকে সাহায্য করবে।'

'আমাকে কে সাহায্য করবে?'

'কেন, আমি,' বলে পকেট থেকে নিজের রিভলবারটা বের করল রানা। 'আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করছি। আমার সঙ্গে পুলিসের গাড়িতে চড়ে থানায় যাবে তুমি।'

'ও, তারমানে সিভিল ড্রেসে পুলিস আপনি,' মামুনের গলায় তাচ্ছিল্য। 'পুলিসকে আমি ঘৃণা করি। আপনি যদি আর এক পা-ও এগোন, এখুনি আমি লাফ দেব।'

'কেন, শেষ সিগারেটটা ধরাবে না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল রানা। 'তোমার ধারণা ভুল। আমি পুলিস নই। তবে সরকারের এমন একটা বিভাগে চাকরি করি, ওরা আমার অনুরোধ ফেলতে পারবে না। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি, এটা যদি বিশ্বাস করতে না পারো, আমার আর কিছু করার থাকে না। সেক্ষেত্রে আমি বলব, সিগারেটটা ধরাও, আয়েশ করে ধোঁয়া গেলো, তারপর লাফ দাও–কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে বাধা দেব না।'

কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মামুন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে আটকাল। দেশলাই বা লাইটারের খোঁজে পকেট হাতড়াল, না পেয়ে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'দেশলাই হবে?'

রিভলবার ধরা হাতটা শরীরের পাশে ঝুলছে, খালি হাতটা পকেটে ভরে ছেলেটার দিকে এগোল রানা। দেশলাই নয়, লাইটার বের করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে মামুন। 'থামুন,' কঠিন সুরে বলল সে। 'লাইটার ধরা হাতটা লম্বা করুন।'

তাই করল রানা। ওর লম্বা করা হাত থেকে লাইটারটা নেয়ার জন্যে মামুনকেও হাত বাড়াতে হলো। মাত্র দু'আড়াই হাত দূরে থেকে ছেলেটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ হলো রানার। চেহারায় এত মায়া, চোখ দুটো এত বুদ্ধিদীপ্ত, অন্য কোন পরিস্থিতিতে বিশ্বাস করত না যে এই ছেলে ব্যাংক ডাকাতি করতে পারে। মায়াই লাগল।

মামুন যেন রানার এই অন্যমনস্কতার অপেক্ষাতেই ছিল। লাইটারটা না ছুঁয়ে ওর কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে, দুটো শরীর পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে গেল। দু'জনেই ছাদের কিনারা থেকে নিচে পড়ে যাবে, এই ভয়ে আতঙ্কিত হলো রানা, আর সেই সুযোগে ওর ডান হাত থেকে রিভলবারটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল মামুন। কিনারায় টলছে দু'জন, তবে একা রানা নয়, মামুনও সতর্ক–নিচে পড়ার ইচ্ছা নেই তারও। একহাতে রানাকে জড়িয়ে ধরেছে, অপর হাতে রিভলবার, সেটার মাজল চেপে বসেছে রানার কানের নিচে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড় করে ছাদে উঠে এল একদল পুলিস, নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন ইন্সপেক্টর।

'আমার কথা না শুনলে আপনি কিন্তু সত্যি খুন হয়ে যাবেন,' হিসহিস করে বলল মামুন। 'একটু আগেই বলেছেন, পুলিস আপনার অনুরোধ রাখবে। ওদেরকে বলুন, আমাকে নিরাপদে পালিয়ে যাবার পথ তৈরি করে দিক। লাঠিচার্জ করলে পাবলিক সরে যাবে।'

ইন্সপেক্টরকে রানা বলল, 'রিভলবারটা আমার, লোড করা। ওর যা মনের অবস্থা, সত্যি গুলি করবে। আপাতত আমার কথা ভুলে যান, নিচে নেমে ওর পালাবার পথ করে দিন।'

কথা মতই কাজ করল পুলিস। সিঁড়ি বেয়ে রানাকে নিয়ে নামতে শুরু করল মামুন। গ্রাউন্ড ফ্লোর পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। ইতিমধ্যে বিল্ডিঙের সামনে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে, লাঠিচার্জ করে লোকজনকে সরিয়ে দিয়েছে পুলিস। রাস্তার

ওপারে তাকাল রানা, বলল, 'ওপারে ওটা আমার গাড়ি, তুমি চাইলে যেখানে খুশি নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।'

রাস্তা পার হয়ে গাড়িতে উঠল ওরা, রানার পিছু পিছু মামুন। রিভলবারটা সরিয়ে রানার পাঁজরে ধরেছে সে। 'চালান। আমি রামপুরা বস্তির সামনে নামব।'

পুলিসের দুটো জীপ স্টার্ট নিতে যাচ্ছিল, ইঙ্গিতে ড্রাইভারদের নিষেধ করল রানা। খানিক দূর আসার পর দেখা গেল, পুলিস বা অন্য কেউ ওদের পিছু নিয়ে আসছে না।

পথে তেমন কোন কথা হলো না। রামপুরা বস্তির কাছাকাছি প্রায় নির্জন রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। নিচে নামার জন্যে খালি হাত দিয়ে নিজের দিকের দরজা খুলল মামুন, বলল, 'দুঃখিত, রিভলবারটা ফেরত দিতে পারছি না।'

রানা হাসল। 'এত বড় উপকার করলাম, আর এই তার প্রতিদান?'

'আমার জায়গায় আপনি হলেও এই কাজই করতেন,' বলল মামুন। 'আরেকটা কথা। আমি কোথায় যাই দেখার জন্যে পিছু নেবেন না, সেক্ষেত্রে গুলি করতে বাধ্য হব আমি।'

'তুমি আসলে খুবই কাঁচা, এই লাইনে আসাটাই বোকামি হয়েছে,' বলল রানা, এখনও হাসছে। 'প্রতি পদে শুধু ভুল করছ। তোমার বুঝি ধারণা, ট্রিগার টিপলেই রিভলবার থেকে গুলি বেরোয়? ম্যাগাজিনে গুলি থাকার দরকার নেই?'

স্থির হয়ে গেল মামুন। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ও, বুঝেছি, আমার সঙ্গে চালাকি করছেন!'

হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল রানা। যতটা সম্ভব নিজের দিকের দরজার কাছে সরে বসল। 'ইচ্ছে করলে ট্রিগার টিপে দেখতে পারো। আর যদি জানা থাকে কিভাবে রিভলবার চেক করতে হয়, চেক করে দেখো।'

রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে রিভলবারটা খুলে চেক করল মামুন। ভেতরে সত্যি কোন গুলি নেই। 'তারমানে···আপনি···আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি···।'

প্যান্টের পকেটে হাত ভরে ছ'টা গুলি বের করল রানা। 'ছাদে ওঠার আগে এগুলো বের করে পকেটে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু···কেন?' রক্তশূন্য হয়ে গেছে মামুনের চেহারা।

'বিল্ডিংটার নিচে দুটো লাশ পড়ে থাকতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। লোকজনের কথা শুনে বুঝলাম, ওদের একজন সঙ্গী ছাদে উঠে গেছে, ধরতে পারলে তাকেও গণপিটুনি দেয়া হবে। পুলিসের সঙ্গে কথা বলে একাই ছাদে উঠলাম, ওঠার সময় রিভলবার থেকে বের করে নিলাম সব গুলি। কোণঠাসা অপরাধী কাউকে জিম্মি করার সুযোগ পেলে হাতে স্বর্গ পায়।'

রানার কথার তাৎপর্য বুঝতে দু'তিন সেকেন্ড সময় নিল মামুন। 'তারমানে আপনি ইচ্ছে করে···'

'আমি না চাইলে তুমি আমাকে কাবু করতে পারতে না,' বলল রানা। 'যে-কোন অজুহাতে তোমার নাগালের মধ্যে পৌঁছানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তুমি যাতে আমাকে জিম্মি করতে পারো। তোমাকে বাঁচানোর এটাই ছিল একমাত্র

পথ।'

'আপনি আমাকে চেনেন না, অথচ আমাকে বাঁচানোর জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিলেন?' মামুন হকচকিয়ে গেছে। 'ধস্তাধস্তির সময় ছাদ থেকে পড়ে যেতেও তো পারতেন।'

'ঝুঁকি তো ছিলই। তবে এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে আমি অভ্যস্ত।'

রিভলবারটা রানার কোলের ওপর ফেলে দিল মামুন। দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকল সে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, চলুন–থানায় পৌঁছে দিন আমাকে।'

'সেটাই উচিত। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে তোমার অসুখটা কি জানতে ইচ্ছে করছে।'

'আমার অসুখ? আমার তো কোন অসুখ নেই!' মামুন হতভম্ব।

'অপরাধী মাত্রই অসুস্থ,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'প্রতিটি অপরাধী মানসিক রোগী। সবার নয়, কোন কোন মানসিক রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। সেজন্যেই তোমার অসুখ সম্পর্কে জানতে চাইছি।'

'আমার কোন অসুখ নেই,' ম্লান সুরে বলল মামুন। 'তবে দুঃখ আর ব্যর্থতা আছে। কিন্তু সে-সব আমি কাউকে শোনাতে চাই না।'

'দুঃখ আর ব্যর্থতা কার জীবনে নেই? তারা সবাই কি তোমার মত ব্যাংক ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে? ধরে নিচ্ছি লেখাপড়ার সুযোগ পাওনি তুমি। বাবা গরীব ছিলেন, হয় মারা গেছেন, নয়তো পঙ্গু হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন...'

'আমি ঢাকা ভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে এম.এ করেছি। আমার বাবা গরীবও নন, মারাও যাননি...'

'ছি-ছি, লেখাপড়া শিখে...'

'আমার জীবনের সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন কেন আমি এ-পথে এসেছি...'

'চলো, নির্জন কোন চাইনীজ রেস্তোরাঁয় বসে তোমার কথা শুনি।' স্টার্ট দিয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল রানা।

দীর্ঘ সময় নিয়ে লাঞ্চ খেলো ওরা। মামুন তার কাহিনী শেষ করার পর রানা শুধু একটা প্রশ্ন করল, 'বলছ মাকে সুখী করার জন্যে এই নোংরা পথে পা বাড়িয়েছ, অথচ তাঁকে তুমি একটা টাকাও পাঠাওনি, ঢাকায় নিয়ে এসে নিজের কাছেও রাখোনি–কারণটা কি?'

'আমার মা এত ভাল, ছিনতাই করা টাকা পাঠাতে বিবেকের সায় পাই না।'

'সুযোগ পেলে তুমি সৎ পথে ফিরবে? কাজটা খুব কঠিন, অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে মামুন বলল, 'থানায় আমার বিরুদ্ধে দশ-বারোটা কেস আছে।'

'সেসব আমি সামলাব,' কথা দিল রানা। 'তুমি কষ্ট করতে রাজি কিনা বলো।'

'তার আগে একটা প্রশ্ন। আপনি কে সেটা বলুন।'

'আমি বাংলাদেশ সরকারের একজন এসপিওনাজ এজেন্ট। জেমস বন্ড-এর নাম শোনোনি? ধরে নাও, তারই মত একজন।'

'ও-সব তো থ্রিলার বইয়ের কাল্পনিক চরিত্র বলেই জেনে এসেছি।'

'বাস্তবেও ওদের অস্তিত্ব আছে,' বলল রানা। 'যোগ্য ছেলে পেলে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এজেন্ট বানাই। ঢাকায় আমাদের সেফহাউস আছে, প্রয়োজনে সেখানে লুকিয়ে থাকার সুযোগ করে দিই।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মামুনের হাতে গুঁজে দিল ও। 'যদি আগ্রহ থাকে, এই ঠিকানায় যোগাযোগ কোরো, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা পুলিসকে এড়িয়ে থাকতে হবে। তারপর তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।'

ঝোঁকের মাথায় মামুনকে কথা দিয়ে ফেলে বিপদেই পড়ে যায় রানা। বিসিআই অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদ ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও, মামুন ছিনতাই সহ বিভিন্ন কেসের আসামী শুনে ট্রেনিং কোর্সের ফর্ম দিতে রাজি হলো না, বরং নানা যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল রানা ভুল করতে যাচ্ছে, এই ছেলেকে সুযোগ দেয়াটা বিসিআই-এর জন্যে ঝুঁকি হয়ে যাবে। অগত্যা বাধ্য হয়ে বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সঙ্গে দেখা করতে হলো রানাকে। কিন্তু তিনিও সোহেলকে সমর্থন করলেন, রানার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে জানিয়ে দিলেন মামুনকে কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। কিছুতেই কাজ হচ্ছে না দেখে, জীবনে এই প্রথম বসের সামনে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসল রানা, অনুমতি না চেয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, বলল, 'আমি তাহলে চলে যাচ্ছি, আর কখনও কোন অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে আসব না।'

'চলে যাচ্ছ মানে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান, রানা ইতিমধ্যে চেম্বারের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। 'তুমি কি বিসিআই ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

রানা দাঁড়াল। ঘুরল ও। কিন্তু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল, মাথা ঝাঁকাল না বা মুখেও কিছু বলল না। 'চলে যাচ্ছি,' বলে বিসিআই ছেড়ে চলে যাবার কথাই বোঝাতে চেয়েছে ও, তবে কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে বুক কেঁপে গেল, সাহসে কুলাল না। ভাবল, ওর মৌনতাকেই জবাব হিসেবে ধরে নিক বস্।

'এদিকে এসো,' গম্ভীর সুরে আদেশ করলেন রাহাত খান।

ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা।

'ছেলেটা ভাল নয়। তাকে তুমি ভাল করে চেনোও না। অথচ তার জন্যে নিজের ক্যারিয়ার, ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাইছ?'

রানা নিরুত্তর।

'তার মধ্যে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবার মত কিছু দেখেছ তুমি, তা না হলে তোমার মত অভিজ্ঞ এজেন্টের এরকম জেদ ধরার কথা নয়,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু দুঃখিত, আমরা মুগ্ধ হবার মত কিছু দেখছি না। তবু, শুধু তোমার ওপর আস্থা আছে বলে ছেলেটাকে একটা সুযোগ দেয়ার কথা ভাবা যায়, এক শর্তে।'

রানা কোন কথা বলছে না।

'শর্তটা হলো, ট্রেনিঙের সময় তার ওপর কড়া নজর রাখা হবে,' কঠিন সুরে বললেন রাহাত খান। 'তার আচরণে সামান্য কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে, ট্রেনিং নেয়ার সময় একটু গাফিলতি বা কুঁড়েমির কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কান ধরে বিদায় করে দেয়া হবে তাকে, কারও কোন সুপারিশ বা অজুহাত শোনা হবে না। ঠিক আছে?'

'জ্বী, স্যার, ঠিক আছে,' জবাব দিল রানা।

'আর সে যদি প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি করে, সরাসরি তোমাকে দায়ী করা হবে। কথাটা মনে রেখো।'

'জ্বী, মনে থাকবে,' বলল রানা। 'তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'আবার কি অনুরোধ?'

'ছেলেটাকে আমি নিজে ট্রেনিং দেব।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন রাহাত খান, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দেবে।'

প্রথমে তিন মাস, তারপর ছ'মাস, সবশেষে এক বছরের তিনটে ট্রেনিং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে শেষ করল মামুন; ট্রেনিং-এর সময় প্রতিটি কঠিন পরীক্ষায় প্রথম হলো সে। একুশ মাসের ট্রেনিং শেষে তাকে ছোটখাট অপারেশনে পাঠানো হলো। ফিল্ডেও খুব ভাল কাজ দেখাল ছেলেটা। পরবর্তী দু'বছর কয়েকটা অপারেশনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। চার বছরের মাথায় তাকে আফ্রিকায় পাঠানো হলো রানা এজেন্সির অপারেশন্যাল চীফ করে। [পাঠক জানেন, রানা এজেন্সি আসলে বিসিআই-এরই একটা কাভার।]

মামুন সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল রানা, শুনে মিসেস ভ্যান্স বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, যোগ্য লোকের হাতেই আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দিচ্ছ তুমি। তবে ছোকরার বয়েস বেশ কম, এটাই যা একটু অস্বস্তির কারণ। সে নিশ্চয়ই একা নয়, তার সঙ্গে আরও লোকজন থাকবে, তাই না?'

'অবশ্যই লোকজন থাকবে,' বলল রানা। 'সবাই তারা প্রফেশনাল, মিসেস ভ্যান্স।'

'ব্রাসেলসে আর কি কাজ আমাদের?'

'আর্মস স্মাগলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা,' বলল রানা। 'জঙ্গলে খুনীদের পিছু নিতে হলে সঙ্গে অস্ত্র থাকা দরকার।'

'অস্ত্র নিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকবে কিভাবে? কাস্টমস আর আইনকে ফাঁকি দিয়ে?'

'জিম্বাবুই পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি এক সময় আমার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরে রাজনৈতিক কারণে তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ সৃষ্টি হয়। তিনি আমাদের এই অভিযানে সহযোগিতা করবেন, নাকি বিরোধিতা করবেন, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। যদি সহযোগিতা করেন, সঙ্গে অস্ত্র রাখার অনুমতি পেতে কোন সমস্যা হবে না। আর যদি বিরোধিতা করেন, বাঁকা পথ ধরতে হবে।'

'দুনিয়ার সব পুলিসই ঘুষ খায়,' মিসেস ভ্যান্স সবজান্তার সুরে বললেন। 'টাকার প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে ইতস্তত কোরো না।'

'ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি খাঁটি দেশপ্রেমিক,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তাঁর বাবার কয়েকশো কোটি ডলারের সম্পত্তি আছে। ঘুষ সাধলে আমাকে তিনি সোজা জেলে পাঠাবেন।'

'ওহ্। তা আমি আর সিলভিয়া উঠছি কোথায়?'

'ফাইভ স্টার হিলটনের একটা স্যুইটে,' বলল রানা। 'পাশের স্যুইটে আমি আর মামুন থাকব। ওখানেই লোটন নড্‌বেল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'নড্‌বেলের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকেও সঙ্গে রেখো,' প্রায় নির্দেশের সুরে বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'তোমরা কি প্ল্যান-পরিকল্পনা করো আমারও সব জানা দরকার।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

মানুষ শিকারী জন বিলফোর্ড হেগেল এখন হারারেতে। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ সে, কারণ ড্যান হেগেল ছেলেকে আরও তিনটে খুন করার অনুমতি দিয়েছে। সাইফুর রহমান ও জেসিকাকে খুন করার সময় টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল ব্যবহার করেছিল বিলফোর্ড, খোদাবক্স মৃধ্যাকে হত্যা করে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাড়ি-বোমা ফাটিয়ে। এবার সে সিদ্ধান্ত নেয়, তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগীকে খুন করবে হয় ছুরি দিয়ে, নয়তো বিষ প্রয়োগে। সঙ্গে একটা রিভলবারও আছে, তবে সেটা আত্মরক্ষার জন্যে; একান্ত প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করবে না।

তিনহপ্তা হলো রাজধানী হারারেতে রয়েছে বিলফোর্ড, কিন্তু সরকারী ক্যান্সার হাসপাতালের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারছে না। ডক্টর খোদাবক্স মৃধা খুন হবার পর 'হু'-র কয়েকজন কর্মকর্তা এসেছেন জেনেভা থেকে, ধনকুবের চীনা রোগীদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করছেন তাঁরা, কেউ জানে না কি নিয়ে আলাপ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। হাসপাতালের নার্স আর আয়াদের ঘুষ দিয়েও কোন তথ্য আদায় করতে পারেনি বিলফোর্ড। পুলিসের কড়া পাহারা থাকায় নিজেও ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তারপর, হঠাৎ, একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কয়েকজন অপারেটর হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে পাহারা দিতে শুরু করল। খোঁজ নিয়ে বিলফোর্ড শুধু জানতে পারল, ওদেরকে রানা এজেন্সি থেকে পাঠানো হয়েছে।

'হু'-র কর্মকর্তারা গতকাল জেনেভায় ফিরে গেছেন। কিন্তু পুলিস আর রানা এজেন্সির এজেন্টরা এখনও পাহারা দিচ্ছে রোগীদের। বিলফোর্ডের কোন রোগ নেই, তবু রোগী সেজে আউটডোরে প্রতিদিনই ঢুকছে সে, দারোয়ান আর নার্সদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তথ্য বের করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে শুধু জানতে পেরেছে, কোটিপতি ক্যান্সার রোগী তিনজনকেই রাখা হয়েছে হাসপাতালের একধারে, আলাদা একটা ছোট বিল্ডিঙে। পুরানো ও বিশ্বস্ত কয়েকজন নামকরা ডাক্তার আর নার্স ছাড়া সেই বিল্ডিঙে কারও ঢোকার অনুমতি নেই। একজন নার্স জানাল, খোদাবক্স মৃধা খুন হয়ে যাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই তিনজন রোগীকে হংকঙে ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হারারে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে একটা প্রাইভেট জেট অপেক্ষা করছে, দু'একদিনের মধ্যে ওই প্লেন

ওদেরকে হংকঙে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

হাসপাতালে ঢুকে চীনা রোগীদের খুন করা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে বিকল্প পথ বেছে নিল বিলফোর্ড। নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর টাকা তুলল সে। ভাড়া করা ফ্ল্যাটে বসে পরচুলা আর নকল গোঁফ লাগিয়ে চেহারা পাল্টাল। আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকজনকে ধরে চোরাই একটা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান কিনল, ভাড়া করল ক্রাইম সিন্ডিকেটের ছয়জন মার্সেনারিকে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ।

শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্টের দক্ষিণ প্রান্তে গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গলে, একটা মাটির ঢিবির ওপর, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান দিয়ে বসিয়ে রাখল ছয়জন মার্সেনারিকে। পজিশনটা বিলফোর্ডেরই বাছাই করা। চীনা ধনকুবেরদের প্রাইভেট জেটটা একটা হ্যাঙ্গারে রাখা হয়েছে, ওই পজিশন থেকে সেটা পরিষ্কার দেখা যায়।

হাসপাতালের আউটডোর থেকেই আসল তথ্যটা পেল বিলফোর্ড। কাল সকালে হংকঙে ফিরে যাবে চীনা রোগীরা। সকালের অপেক্ষায় না থেকে রাতেই মার্সেনারিদের সঙ্গে যোগ দিল সে, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের পাশে মশারি টাঙিয়ে নাক ডেকে ঘুমাল।

সকালে ঘুম ভাঙার পর তিনজন মার্সেনারিকে শহরে ফেরত পাঠাল বিলফোর্ড। তিনজনই তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিনটে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। আকাশে ওঠামাত্র প্লেনটাকে ফেলে দেবে বিলফোর্ড, আধমাইল হেঁটে পাকা রাস্তায় উঠবে। ওখানে দুটো গাড়ি অপেক্ষা করবে তাদের জন্যে। একটায় একা চড়বে সে, বাকি গাড়িতে উঠবে তিনজন মার্সেনারি। দুটো গাড়ি দু'দিকে চলে যাবে। অন্তত মার্সেনারিদের সে-কথাই জানানো হয়েছে।

শহর ত্যাগ করার আগে তিনবার গাড়ি বদল করবে বিলফোর্ড।

প্ল্যানটা নিখুঁত। এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি গার্ড বা পুলিস তদন্ত শুরু করার আগেই অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ফেলে পালিয়ে যাবে ওরা। পালাবার আগে পজিশন থেকে নিজেদের সব জিনিস সরিয়ে ফেলা হবে, শুধু গানটা বাদে। গানটা ওখানে পড়ে থাকলেও, তাতে ওদের কারও হাতের ছাপ পাওয়া যাবে না।

সকাল ন'টায় হ্যাঙ্গার থেকে বের করা হলো প্রাইভেট জেট। দশটার মধ্যে ফুয়েল ভরার কাজ শেষ হলো। গ্রাউন্ড ক্রুরা শেষবারের মত চেক করল প্লেন। পাইলট আর স্টুয়ার্ডরা এল সাড়ে দশটায়। রোগীদের নিয়ে অ্যামবুলেন্স পৌঁছুল এগারোটায়। প্লেনের দরজা বন্ধ হলো সোয়া এগারোটায়। এগারোটা তেইশ মিনিটে প্রাইভেট জেট আকাশে ডানা মেলল।

অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের সাইটে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে বিলফোর্ড, নিঃশব্দে চুইংগাম চিবাচ্ছে, চেহারায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নেই। নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে দুটো ব্যাগে ভরে নিয়েছে মার্সেনারিরা। আর মাত্র একটা কাজ বাকি—গুলি খেয়ে প্লেনটা আকাশ থেকে পড়ে যাবার পর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান মোছা, ওটায় যাতে বিলফোর্ডের হাতের ছাপ না থাকে।

ট্যাক্সিওয়ে থেকে ছুটে এসে আকাশে উঠল প্রাইভেট জেট। ওদের পজিশন

থেকে টেকঅফ পরিষ্কার দেখা গেল। ওদের অনেকটা ডান দিকে রয়েছে প্লেন, নাকের সামনে দিয়ে বাম দিকে উড়ে যাবে। সহজ টার্গেট, কোন সমস্যা হবার কথা নয়।

হলোও না। নাক বরাবর সামনে পাঁচশো গজের মধ্যে চলে এল প্রাইভেট জেট, রানওয়ে থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠতে পেরেছে ইতিমধ্যে। সাইটে চোখ রেখে ট্রিগার টেনে নিল বিলফোর্ড।

শেলগুলো কোথায় লাগল দেখার সুযোগ ঘটল না, প্রায় চোখের পলকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো প্লেনটা। সিধে হলো বিলফোর্ড, পিছিয়ে এল দুই পা। মার্সেনারিরা দ্রুত সামনে বাড়ল, ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মুছছে। হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে তিনজনের মাথায় তিনটে গুলি করল বিলফোর্ড। ঠিক সেই মুহূর্তে রানাওয়েতে বিধ্বস্ত হলো জ্বলন্ত প্রাইভেট জেট, ফলে গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল।

ব্যাগ দুটো কাঁধে ফেলে ঘুরল বিলফোর্ড, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটল। গাড়ি বদলের সময় বাকি তিন মার্সেনারিকেও খুন করবে সে। শহরের ভেতর এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাবার পর সাক্ষী রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তিনজনের জায়গায় নয়জনকে খুন করায় বাবা ড্যান ক্লিফোর্ড হেগেন নিশ্চয়ই তার পিঠ চাপড়ে দেবে।

দুই

এয়ারপোর্টে মামুন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রথম সাক্ষাতেই অপ্রত্যাশিত ও বিব্রতকর এক ঝাঁক প্রশ্ন করলেন তাকে মিসেস ভ্যান্স। কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসায় ক্রিমিনালরা তাঁকেও হত্যা করতে চাইতে পারে, এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে মামুনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–আশপাশে ছদ্মবেশী লোকজন রেখেছ তো? তোমার সঙ্গে রিভলবার আছে? রিভলবারে বুলেট আছে কিনা চেক করেছ? হোটেলের যে স্যুইটে আমি থাকব, সেখানে পাহারা বসানো হয়েছে? ভুলে যেয়ো না, প্লেনটার ওপরও নজর রাখা দরকার, সুযোগ পেলে ওরা বোমা রেখে যেতে পারে।

মামুনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হাসিখুশি বিনয়ী ভাবটা চেহারায় অম্লান। এমন কি রানার দিকে একবার আড়চোখে তাকালও না। ভাড়া করা একটা গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করছে সে। হোটেলে যাবার পথে পাশে বসা রানাকে নিচু গলায় জিম্বাবুইয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করল। ডক্টর খোদাবক্স মৃধা হংকং থেকে যে তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগীকে হারারেতে আনিয়েছিলেন তারা খুন হয়ে গেছে, এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় কুখ্যাত ছ'জন মার্সেনারির লাশ পাওয়া গেছে। জিম্বাবুই পুলিস জানিয়েছে, হংকংগামী প্রাইভেট জেটটা রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওঠার পরপরই ওটাকে গুলি করে ফেলে

দেয়া হয়। এয়ারপোর্টের পাশের জঙ্গল থেকে একটা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান উদ্ধার করা হয়েছে।

হোটেলে, নিজের স্যুইটে, দরজা বন্ধ করে মামুনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করল রানা। আগেই খবর দেয়া হয়েছিল, আধ ঘণ্টা পর হাজির হলো লোটন নড্‌বেল। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা সে, গায়ের রঙ চকচকে কালো, একহারা গড়ন, শরীরটা যেন পাকানো রশির সমষ্টি, চেহারা দেখে কার সাধ্য বয়েস ধরতে পারে।

নড্‌বেলের সঙ্গে নিভৃতে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। নার্স সিলভিয়াকে পাহারায় রেখেছিলেন মিসেস ভ্যান্স, পাশের স্যুইটে কে আসছে না আসছে লক্ষ রাখার জন্যে। সিলভিয়া রিপোর্ট করল, 'কালো একটা লম্বা ভূতকে দেখলাম, মিসেস ভান্স। আমাকে দেখে ভেংচাল।'

'সত্যি ভেংচাল?' হুইলচেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন মিসেস ভ্যান্স।

থতমত খেয়ে সিলভিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'কি জানি, তা নাও হতে পারে। বোধহয় শুধু হেসেছে। অসম্ভব কালো তো, আর দাঁতগুলো এত সাদা, দেখে সন্দেহ হলো ভেংচাচ্ছে।'

'ও।' স্যুইটের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন মিসেস ভ্যান্স। পাশের স্যুইটে নক করলেন। দরজা খুলে দিল মামুন। হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। 'আমাকে খবর দেয়া হয়নি কেন?' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি, তোমরা কি প্ল্যান করো আমাকে তা জানতে হবে।'

'আসুন, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'আমার বন্ধু লোটন নড্‌বেলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই—এইমাত্র পৌঁছেছে ও।'

এগিয়ে এসে মিসেস ভ্যান্সের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল নড্‌বেল।

'ইংরেজি জানা আছে তো?' মাথাটা একদিকে কাত করে নড্‌বেলকে নিরীক্ষণ করছেন মিসেস ভ্যান্স, হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলেন।

হেসে ফেলল নড্‌বেল। হাতটা টেনে নিল।

মিসেস ভ্যান্স বিড়বিড় করলেন, 'সিলভিয়া ভুল বলেনি।'

'মানে?' জানতে চাইল মামুন। 'কি বলেছে সিলভিয়া?'

'সে-কথা থাক। আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' বললেন মিসেস ভ্যান্স।

নড্‌বেলের হয়ে জবাব দিল রানা, 'লোটন নড্‌বেল কেমব্রিজ থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছে, মিসেস ভ্যান্স। সাধারণ আমেরিকান বা ইংরেজদের চেয়ে শুদ্ধ ইংরেজি বলে ও।'

'আচ্ছা! শুনে খুশি হলাম।' ভদ্রমহিলাকে একটু যেন হতাশই দেখাল। তবে এবার তিনি নিজেই হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়ালেন।

'ওর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না,' বলল রানা। 'তবে সে-সব শুনে আপনার কাজ নেই। শুধু জেনে রাখুন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জিম্বাবুই টেরোরিস্টদের স্বর্গ হয়ে উঠেছিল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে নড্‌বেল।

দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকারদের একজন বলা যেতে পারে ওকে। জিম্বাবুইয়ের বনভূমিতে বিশ বছর কাটিয়েছে।'

পিছিয়ে এসে একটা সোফায় বসল নড্‌বেল। 'আপনার মেয়ে জেসিকা জিম্বাবুইয়ের গভীর জঙ্গলে কি করছিল, মিসেস ভ্যান্স?'

জবাব দিল রানা, 'জেসিকার বয়ফ্রেন্ড ছিল সাইফুর রহমান মৃধা। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াত সাইফুর। সে একজন জুলজিস্ট, লেক ক্যারিবা তৈরি হবার পর ওয়াইল্ড লাইফের ওপর তার কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে জানার জন্যে রিসার্চ করছিল। আফ্রিকান জঙ্গল সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল, বয়েস বত্রিশ, একা কাজ করতে পছন্দ করত, সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখত না।'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল নড্‌বেল।

'কি বললেন?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন মিসেস ভ্যান্স।

'বললাম, এ-ধরনের পাগলামির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে,' জবাব দিল নড্‌বেল। 'এটাকে ম্যাশো সিনড্রোম বলে, পৌরুষ দেখাবার প্রবণতা–বিপদের তোয়াক্কা না করে মা-জননী প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা। কিন্তু আপত্তিটা হলো, সঙ্গে কোন শহুরে মেয়ে কেন থাকবে। তাছাড়া, প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার জন্যে এত থাকতে ওই এলাকায় কেন যাবে। হাতি আর গণ্ডার মারার জন্যে হাই-পাওয়ারড্ অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে পোচাররা যেখানে ঘুর-ঘুর করছে?'

'সাইফুরকে খুব একটা দায়ী করা উচিত নয়,' মিসেস ভ্যান্স বললেন। 'বুলাওয়েওতে কয়েক হপ্তা ছিল সে, তখনই তার প্রেমে পড়ে যায় জেসিকা। ব্যাপারটা সে আমাকে চিঠি লিখে জানায়। এতে আমার ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু চিঠিটা সে আমার অনুমতি পাবার জন্যে লেখেনি। সাইফুরের সঙ্গে ফিল্ড ট্রিপে যাচ্ছে, এই খবরটা দেয়ার জন্যে লিখেছিল। বিপদের ঝুঁকি আছে, তাই সাইফুর ওকে সঙ্গে নিতে চায়নি। কিন্তু জেসিকার জেদ, সে যাবেই। চিঠিতে আরও জানায়, সাইফুর কোথায় ক্যাম্প ফেলবে তা সে জানে, ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে ভিক্টোরিয়া ফলস দেখে আসবে। মি. নড্‌বেল, আমার মেয়ে জেসিকা পরীর মত দেখতে ছিল। সাধারণ একজন জুলজিস্ট তার কথায় উঠবে-বসবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।'

ক্ষীণ হেসে নড্‌বেল বলল, 'আপনাকে দেখেই আপনার মেয়ে সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছি আমি, মিসেস ভ্যান্স।' রানার দিকে ফিরল সে। 'পোচার, রানা?'

'হ্যাঁ, তবে সাধারণ পোচার নয়। ওই এলাকায় হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা গণ্ডার আছে। জিম্বাবুই পুলিস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে অ্যান্টি-পোচিং পেট্রল ওই জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। সাইফুর আর জেসিকার সঙ্গে কথাও বলেছে তারা। ক্যাম্পের চারপাশে পরে কোন পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা ডাকাতি নয়, কারণ কিছুই চুরি যায়নি। লাশ পাওয়া যায় তিন দিন পর, তার আগে এলাকায় তুমুল বৃষ্টি হয়েছে।'

'বুলেট?'

'সেভেন পয়েন্ট সিক্স-টু মিলিমিটার।'

'ক'টা?'

'তিনটে, একই রাইফেল থেকে। সাইফুরকে দু'বার গুলি করা হয়, পেটে আর মাথায়। জেসিকা মারা গেছে বুকে গুলি খেয়ে।'

'একা একটা লোক?'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'ক্লোজ টার্গেট?'

'চার থেকে ছয়শো মিটার দূর থেকে গুলি করা হয়েছে।'

'প্রফেশনাল?'

'ধরে নিতে হয়।'

মিসেস ভ্যান্সের ইঙ্গিতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সিলভিয়া, হাতে ব্র্যান্ডির গ্লাস নিয়ে ফিরে এল। নার্সের হাত থেকে সেটা নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিলেন ভদ্রমহিলা। সেদিকে একবার তাকিয়ে নড্‌বেলের দিকে ফিরল রানা, বলল, 'সাইফুরের হাতে লম্বা একটা কাঠি ছিল, শেষ মাথাটা পুড়ে কালচে হয়ে গেছে। ওদেরকে গুলি করা হয়েছে খোলা একটা ক্যাম্পফায়ারের পাশে। আমার ধারণা, আগুনটা কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল সাইফুর, তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল জেসিকা। স্নাইপার তাকেই প্রথমে গুলি করে, কারণ দাঁড়িয়ে থাকায় তারই ছুটে পালাবার সুযোগ ছিল। সরাসরি বুকে গুলি করায় বোঝা যাচ্ছে, লোকটা তার কাজ বোঝে। দ্বিতীয় গুলিটা করে সাইফুর যখন সিধে হচ্ছে। ফলে বুলেটটা পেটে লাগে। গুলি খেয়ে ঘুরে যায় সাইফুর, তৃতীয় বুলেট আঘাত করে মাথার পিছনে, খুলিতে।'

'লোকটা বুলেট অপচয় করেনি,' বলল নড্‌বেল। 'কোন ছাপই পাওয়া যায়নি?'

'সব ধুয়ে গেছে।'

'কেসিং?'

রানা মাথা নাড়ল।

'প্রফেশনাল।' চিন্তিত দেখাল নড্‌বেলকে। 'ডক্টর খোদাবক্স মৃধা সম্পর্কে বলো এবার, রানা।'

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জেনেভা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক তথ্যই জানতে পেরেছে রানা, সংক্ষেপে সে-সব নড্‌বেলকে জানাল। খোদাবক্স মৃধা জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে একটা বই লিখেছিলেন, তাতে একটা পরিচ্ছেদ ছিল প্রাচীন চীনা ওষুধ সম্পর্কে। ওই পরিচ্ছেদে তিনি প্রমাণ করেন হাজার বছর ধরে প্রচলিত যে-সব ওষুধ চীনারা তৈরি করছে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। এই বই পশ্চিমা দুনিয়ায় বেশ সাড়া ফেলে। তারপরই 'হু'-র তরফ থেকে গণ্ডারের শিং নিয়ে রিসার্চ করার প্রস্তাব পান তিনি।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে চীনারা বিশ্বাস করে আসছে গণ্ডারের শিঙের গুঁড়ো অত্যন্ত উদ্দীপক। ধনী বয়োবৃদ্ধ চীনারা একাধিক উপপত্নী রাখতে পছন্দ করে, তাই যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির আশায় গণ্ডারের শিং গুঁড়ো করা পাউডার নিয়মিত সেবন করে তারা। শুধু ধনীদের মধ্যেই এই পাউডার জনপ্রিয়, কাজেই দামও অবিশ্বাস্য। সমস্যা হলো, পোচাররা প্রায় সব গণ্ডার মেরে ফেলায় ওই পাউডার এখন দুনিয়ার সবচেয়ে দামী বস্তু হয়ে উঠেছে। ইয়েমেনেও গণ্ডারের শিং-এর চাহিদা আছে,

ছোরার হাতল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে হংকং আর তাইওয়ানে আকাশচুম্বি দামে বিক্রি হয় অ্যাফ্রোডিযিয়াক হিসেবে।

কথার মাঝখানে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল রানা। তারপর আবার শুরু করল।

খোদাবক্স মৃধা গণ্ডারের শিং নিয়ে গবেষণা করার সময় জিনিসটার বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করেন। গবেষণার ফলাফল প্রথমে তিনি লিখে রাখতেন, তারপর কমপিউটরে তুলতেন। তাঁর ল্যাবে খরগোশ, ইঁদুর আর শুয়োর ছিল; এগুলোর ওপর ওই পাউডার ব্যবহার করে তিনি দেখতে পান প্রতিটি প্রাণীর যৌন-উত্তেজনা বেড়ে গেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওগুলো ক্যান্সারেও আক্রান্ত হয়েছে। গণ্ডারের শিং-এ ক্যান্সার সৃষ্টি করার মত উপাদান আছে, এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার জন্যে আরও তিনমাস গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি খুন হয়ে গেলেন।

এসব তথ্য জানা গেছে ভাইপো সাইফুর রহমান মৃধাকে লেখা তাঁর একটা চিঠি থেকে। চিঠিটা তিনি হারারে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সাইফুরের ঠিকানায় পাঠান; কিন্তু সে-সময় সাইফুর জিম্বাবুইয়ের জঙ্গলে থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক বিভাগ খোদাবক্স মৃধার কাছে ফেরত পাঠায়। তিনি খুন হবার দু'হপ্তা পর চিঠিটা তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। ফ্ল্যাটে পুলিস পাহারা ছিল, তারাই এনভেলাপটা গ্রহণ করে। পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানির সঙ্গে দেখা করে তদন্তের স্বার্থে কাজে লাগবে বলে সেটা চেয়ে এনেছে মামুন।

রানা থামতে নড্‌বেল জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর খোদাবক্স মৃধা কি নিয়ে গবেষণা করছেন, এটা খুনীরা জানতে পারল কিভাবে?'

'ডক্টর কোন রকম বিপদের আশঙ্কা করেননি, তাই গবেষণার ব্যাপারটা গোপন রাখার কথাও ভাবেননি,' বলল রানা। 'জিম্বাবুই স্বাস্থ্য বিভাগকে অনুরোধ করে হংকং থেকে তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগীকে হারারেতে আনার ব্যবস্থা করেন তিনি। তিনজনই তারা ওই পাউডার ব্যবহার করত। ক্যান্সার হাসপাতালের আলাদা একটা বিল্ডিঙে রাখা হয়েছিল তাদের। হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা জানত কেন তাদেরকে হংকং থেকে আনা হয়েছে, ডক্টর খোদাবক্স কি নিয়ে গবেষণা করছেন।'

'তারমানে কি খুনীরা শুধু পোচার নয়,' বলল নড্‌বেল। 'তারা গণ্ডারের শিং পাউডার বানিয়ে বিদেশেও পাঠায়।'

'হ্যাঁ।'

'এতগুলো খুন নিখুঁতভাবে করতে পারল, নিশ্চয়ই এর পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট জড়িত,' মন্তব্য করল মামুন।

নড্‌বেল বলল, 'জিম্বাবুইয়ের বেশিরভাগ বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলেও, তিন-চার প্রজন্ম আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা কয়েকটা শ্বেতাঙ্গ পরিবার এখনও তাদের ভূ-সম্পত্তি নিজেদের দখলে রেখেছে। এরা বেশিরভাগই ভূমি মন্ত্রণালয়কে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে নিজেদের কয়েকশো একর জায়গা অ্যাকোয়্যার হতে দেয়নি।

রানা বলল, 'এদের সম্পর্কে আর কি জানি আমরা?'

'সবাই এরা পোচারদের পালছে, গাছ কেটে বনজ সম্পদ উজাড় করছে,' বলল নড্‌বেল। 'সরকারী বনরক্ষীরা এদেরকে যমের মত ভয় পায়। সামন্ত রাজাদের মত জীবনযাপন করে ওরা। সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়। প্রত্যেকে কোটিপতি। অনেকেরই ছোটখাট প্রাইভেট সেনাবাহিনী আছে। তাদের এলাকায় সরকারী আইন চলে না। যে যার এলাকায় নিজের ইচ্ছামত আইন তৈরি করে নিয়েছে। পুলিস বা আর্মিকে তারা পাত্তাই দেয় না। প্রাইভেট সেনাবাহিনীতে বেশিরভাগই দাগী ম্যাটাবেলদের নেয়া হয়।'

'প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, আমরা তাকে ছোট করে দেখতে পারি না,' বলল মামুন।

নড্‌বেল বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো না, রানা।'

'বলো।'

'ডক্টর খোদাবক্স কেন খুন হলেন তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, কিন্তু তার ভাইপো সাইফুর রহমান কেন খুন হলেন?'

'ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যময় লাগছে,' মিসেস ভ্যান্স বললেন। 'গবেষণার ফলাফল প্রকাশ পেলে পাউডার ব্যবসায়ীর ব্যবসা মার খাবে, চীনা বুড়ো-হাবড়ারা ক্যান্সার হবার ভয়ে ওই জিনিস আর কিনবে না, কাজেই সে ডক্টর খোদাবক্সকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সাইফুর বা জেসিকা তো এ বিষয়ে কিছুই জানত না। ওদেরকে তাহলে খুন করা হলো কেন?'

হাতের চিঠিটা দেখাল রানা। 'এর উত্তর আছে এই চিঠিটায়। চিঠিটা পড়লে বোঝা যাবে, নিজের গবেষণার বিষয়-বস্তু ও অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত ভাইপোকে সব কথা জানাতেন খোদাবক্স। সাইফুর রহমান তাঁকে গণ্ডারের শিং নমুনা হিসেবে দু'একবার পাঠিয়ে ছিল। এই শিং সাইফুর কোত্থেকে যোগাড় করে, তা অবশ্য জানা যায়নি।'

রানা থামতে মামুন বলল, 'ক্যান্সার হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সাইফুর রহমান গণ্ডারের শিং পাঠিয়েছেন, গল্পচ্ছলে কথাটা হাসপাতালের অনেককেই বলেছেন ডক্টর খোদাবক্স। ভাইপোকে তিনি নিয়মিত চিঠি লেখেন, এটাও গোপন করেনি। শেষ চিঠিটা পোস্ট করার আগে তিনি একজন ডাক্তারকে বলেছিলেন, সাইফুর জিম্বাবুই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরেছে কিনা না জেনেই চিঠিটা পোস্ট করছেন।'

'খুনীরা জানত খোদাবক্স কি নিয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার ফলাফল কি হতে যাচ্ছে তা-ও জানত। সেজন্যেই ডক্টর খোদাবক্সকে খুন করে ক্ষান্ত হয়নি, ল্যাবেও আগুন দেয়। ওদিকে সন্দেহের বশে সাইফুর আর জেসিকাকেও ছাড়েনি।'

নড্‌বেল থামতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তাহলে কোত্থেকে তদন্ত শুরু করব, দোস্ত?'

'তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' বলল নড্‌বেল। 'মিসেস ভ্যান্স কি আমাদের সঙ্গে জিম্বাবুই পর্যন্ত যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' তাড়াতাড়ি বললেন মিসেস ভ্যান্স।

'ব্যাপারটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে,' বলল নড্‌বেল, গম্ভীর। 'এ যেন অনেকটা প্রতিপক্ষকে আবার আঘাত হানার জন্যে প্ররোচিত করা। ওরা যে হিংস্র আর ভয়ঙ্কর, তা কি ব্যাখ্যা করার দরকার আছে?'

'তোমার সঙ্গে একমত আমি,' বলল রানা। 'মিসেস ভ্যান্স, আপনি আরেকবার চিন্তা করে দেখুন।'

'আমি একবার কোন সিদ্ধান্ত নিলে সহজে সেটা পাল্টাই না,' জেদের সুরে বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'আমার মেয়েকে যারা খুন করেছে তাদেরকে তোমরা শায়েস্তা করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছ, এটা আমি খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। সেই সঙ্গে এ-ও চাই যে আমার নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করবে তোমরা। তোমরাই বরং চিন্তা করে দেখো, আমার শর্ত পূরণ করা সম্ভব কিনা। কোন রকম সংশয় থাকলে এখনই বলো, আমি অন্য এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

নড্‌বেলের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল নড্‌বেল। 'রানা, রাজধানীতে আমাদের কারও থাকা দরকার। আমি চাই মামুন থাকুক, কারণ ওর সঙ্গে পুলিস বিভাগের সম্পর্ক ভাল। হারারের আন্ডারগ্রাউন্ডে কি ঘটছে না ঘটছে সে খবরও রাখতে হবে ওকে।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তদন্ত শুরু করার আগে অস্ত্র দরকার আমাদের,' মনে করিয়ে দিল নড্‌বেল। 'রাইফেল আর হ্যান্ড-গান। হারারে থেকে প্রথমে আমরা বুলাওয়েওতে যাব, ওখানে একদিন থেকে প্লেন নিয়ে যাব ভিক্টোরিয়া ফলস-এ। অপারেশন্যাল এরিয়া থেকে ওটাই সবচেয়ে কাছাকাছি শহর। ওখানে ভাল কয়েকটা হোটেল আছে, মিসেস ভ্যান্সের থাকতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'আমি হোটেলে থাকব, আর তোমরা?' রানাকে প্রশ্ন করলেন মিসেস ভ্যান্স।

রানা বলল, 'নড্‌বেল আর আমি জঙ্গলে ঢুকব।'

'উদ্দেশ্যটা কি? জঙ্গলে তোমরা কি পাবে বলে আশা করছ?'

'জঙ্গলে কি পাব তা এখানে বসে বলা বা আন্দাজ করা সম্ভব নয়, মিসেস ভ্যান্স,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'খুনী বা খুনীরা যদি কোন সূত্র ফেলে গিয়ে থাকে, ইতিমধ্যে সব ধুয়ে-মুছে গেছে।'

'তাহলে শুধু শুধু জঙ্গলে ঢোকা কেন? এত আয়োজন, এত টাকা খরচ, তা কি শুধু তোমাদের বেড়ানো বা শিকারের শখ মেটানোর জন্যে?'

'টাকা?' নড্‌বেলকে হতভম্ব দেখাল। 'মিসেস ভ্যান্স, কোথাও নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবুঝির একটা ব্যাপার ঘটেছে। রানা আমার বন্ধু, প্রয়োজনে বিপদের সময় পরস্পরকে আমরা সাহায্য করি। ও ডেকেছে, আমি চলে এসেছি—এখন যদি আমাকে নরকেও নিয়ে যেতে চায়, হাসতে হাসতে যাব। এরমধ্যে লাভ-লোকসান বা টাকার কোন ভূমিকা তো নেই।'

'রানা?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস ভ্যান্স।

'আমি তো লরেলিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি, এই অপারেশনে রানা এজেন্সি কোন ফি নেবে না,' বলল রানা।

'ও, বুঝতে পেরেছি। টাকা নেবে না, তাই নিজেদের প্ল্যান সম্পর্কে সব কথা আমাকে বলতে চাইছ না।'

রানা বলল, 'টাকা নিলেও বলতাম না, মিসেস ভ্যান্স। শুধু আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে নয়, কেসটার স্বার্থেও।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না,' বলে হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে নিলেন মিসেস ভ্যান্স। মামুন দরজা খুলে দিতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নড্‌বেল বলল, 'ওনাকে নিয়ে ঝামেলা হতে পারে, রানা।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, উনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীর মা,' বলল রানা। 'তার সম্মানে ওঁকে কিছু বলা যাবে না।'

দরজার দিকে এগোচ্ছে সিলভিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আপনারাও একটা ভুল করছেন। ওনার মেয়ে খুন হয়েছে, অথচ তার খুনীকে ধরার জন্যে টাকা খরচ করার সুযোগ দিচ্ছেন না ওঁকে।'

মামুন জিজ্ঞেস করল, 'ওনার নার্স হিসেবে কতদিন কাজ করছ তুমি?'

'দু'মাস। গত ছ'মাসের খবর জানি, পাঁচজন নার্সের চাকরি খেয়েছেন। আমি ছ'নম্বর। আগের তুলনায় ওনার মেজাজ এখন প্রায় মাখনের মত।'

চোখ কপালে তুলে অসহায় একটা ভঙ্গি করল মামুন।

ব্যবসার কাজ ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় নিল লোটন নড্‌বেল। তাকে আর মামুনকে নিয়ে আরেকবার আলোচনায় বসল রানা। অস্ত্র সংগ্রহ, লাইসেন্স পাওয়া, জিম্বাবুই পুলিসের সহযোগিতা আদায়, এই তিনটে সমস্যার কথা তুলল ও। আলোচনার শুরুতেই মামুন জানাল, 'এসব বিষয়ে জিম্বাবুই পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আগেই আমার কথা হয়েছে। কোন সমস্যা হবে না।'

মামুন যে জাদু জানে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন হারারেতে পৌঁছুনোর পর। হোটেল ইন্টারকনে উঠল ওরা, আগের মতই পাশাপাশি দুটো স্যুইটে। আধ ঘণ্টাও পেরোয়নি, মিসেস ভ্যান্সের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমেরিকান অ্যামব্যাসাডর জন মিচেল। কংগ্রেস সদস্যা লরেলি তাঁকে ফোন করে মায়ের হারারে সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা আভাস দিয়েছে। মিসেস ভ্যান্সকে সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তাব দিলেন তিনি। ফল হলো অপ্রত্যাশিত। মিসেস ভ্যান্সের মনে বিপুল রাগ আর ক্ষোভ জমে ছিল, এই সুযোগে সব উপুড় করে ঢেলে দিলেন। মার্কিন জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্স জিম্বাবুই সরকারকে প্রতি বছর দান করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে লাভটা হচ্ছে কি? জিম্বাবুইয়ে কি মানবাধিকার রক্ষিত হচ্ছে? মার্কিন নাগরিক জেসিকা খুন হয়ে গেল, অথচ খুনীরা কেউ ধরা পড়ল না কেন? এই ব্যর্থতার দায়ভার কি অ্যামব্যাসাডর জন মিচেলের ওপরও খানিকটা বর্তায় না? সুরক্ষিত প্রাসাদের মত এমব্যাসীতে বসে মার্কিন জনগণের কি স্বার্থটা তিনি দেখছেন? বিবেক বলে কিছু থাকলে এখনও তিনি পদত্যাগ করেননি কেন?

এতসব প্রশ্ন শুনে রীতিমত ঘেমে গেলেন জন মিচেল। আর সেই সুযোগটাই

কাজে লাগাল মামুন। নার্ভাস অ্যামব্যাসাডরকে নিজেদের স্যুইটে ডেকে এনে খাতির করে বসাল. রানা আর নড্‌বেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর কি ধরনের সাহায্য দরকার সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দিল। তিনটে মার্কিন পাসপোর্ট দরকার ওদের–এমব্যাসী থেকে পাসপোর্ট ইস্যু করার রেওয়াজ থাকায় জন মিচেলের জন্যে এটা কোন সমস্যাই নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে জন মিচেল জানালেন, না, কোন সমস্যা নয়।

'বারো ঘণ্টার মধ্যে সম্ভব?' জানতে চাইল মামুন।

'কাল সকালে হলে চলে না?' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন অ্যামব্যাসাডর। 'আমি মাত্র বাইশ ঘণ্টা সময় চাইছি।'

'ঠিক আছে, তাহলেও হবে,' রাজি হলো রানা।

অ্যামব্যাসাডর বিদায় হবার আধঘণ্টা পর নক হলো দরজায়। দরজা খুলে দিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাল মামুন। সিভিল ড্রেসে স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি রানার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। লম্বা-চওড়ায় সমান, প্রকাণ্ড একটা ফুটবল বললেই হয় ভদ্রলোককে। একে কালো, তার ওপর কালো সুট পরে এসেছেন, কালো জুতো জোড়াও আয়নার মত চকচক করছে।

'মাসুদ রানা,' এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন জন বুকানি। 'অনেক বছর পর আবার দেখা হলো, আশা করি পুরানো দিনের সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে আবার আমরা বন্ধু হতে পারব।'

'আপনাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমিও লড়েছি, সেজন্যে আমি আজও গর্ব অনুভব করি,' বলল রানা। 'প্রথম দিকে আমরা বন্ধুই ছিলাম, কিন্তু যুদ্ধের পর বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এমন লড়াই বাধল, বন্ধু হয়ে গেল শত্রু, শত্রু হয়ে উঠল মিত্র।'

'আমারই দুর্ভাগ্য, আপনি ম্যাটাবেলদের পক্ষ নিয়েছিলেন,' হাসিমুখে বললেন জন বুকানি। 'কিন্তু আমাকে নডেবেল গোত্রের পক্ষ নিতে হয়। আমার আরও দুর্ভাগ্য, একজন নডেবেল হয়েও লোটন ম্যাটাবেলদের পক্ষে যুদ্ধ করে।'

'নড্‌বেলরা শ্বেতাঙ্গদের হয়ে লড়ছিল,' বলল লোটন। 'নীতির প্রশ্নে আমি আপোস করতে পারিনি।'

'এখন কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে,' বললেন বুকানি। 'যুদ্ধের এত বছর পরও শ্বেতাঙ্গদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটুকু কমেনি। অদ্ভুতই বলতে হবে, নড্‌বেলরা শ্বেতাঙ্গদের এখন দু'চোখে দেখতে পারে না, অথচ ম্যাটাবেলরাই শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস বনে গেছে।'

'আমার মনে পড়ছে,' বলল রানা, 'আপনাকে একবার আমি রাইফেলের সাইটে পেয়েছিলাম। দূরত্ব খুব বেশি ছিল, তাই আরও কাছে পৌঁছুবার সিদ্ধান্ত নিই। ওটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। আপনি পালিয়ে যাবার সুযোগ পান। সেদিন রাতে আমাদের দলের চারজনকে আপনি খুন করেন। তাদের মধ্যে লোটনের চাচাতো ভাইও ছিল।'

'সেটা ছিল যুদ্ধ,' বললেন জন বুকানি। 'আমরা পরস্পরের শত্রু ছিলাম।

কিন্তু সময় পাল্টেছে। রানা এজেন্সির অপারেটররা হারারের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে যে অবদান রাখছে, ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মি. মামুনের প্রতি সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।'

'কাজের কথায় আসি,' সুযোগ বুঝে প্রসঙ্গটা তুলল মামুন। 'মি. বুকানি, আরাম করে বসুন, প্লীজ।'

সবাই ওরা সোফায় বসল।

মামুন বলল, 'মিসেস ভ্যান্স, আপনার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।'

'আমি মা। জানি মেয়েকে আর ফিরে পাব না। কিন্তু খুনীকে ধরায় আপনাদের ব্যর্থতা আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।' হুইলচেয়ারের হাতলে ঘুসি মারলেন মিসেস ভ্যান্স। 'আমার তো সন্দেহ, পুলিস ঘুষ খেয়ে খুনীকে পালাতে দিয়েছে।'

জন বুকানি হকচকিয়ে গেলেন।

'তা যদি সত্যি হয়, আমিও পুলিসকে ঘুষ দিতে চাই,' বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'খুনীরা যা দিয়েছে, আমি তারচেয়ে বেশি টাকা দেব–জেসিকার খুনীকে হাজির করুন আমার সামনে।'

সিলভিয়াকে ইঙ্গিত করল রানা। এগিয়ে এসে হুইলচেয়ারটা ঘোরাল নার্স। 'মিসেস ভ্যান্স, আপনি ক্লান্ত, চলুন বিশ্রাম নেবেন...'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন মিসেস ভ্যান্স। চেয়ারটা স্যুইট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল, তারপরও সবাই শুনতে পেল তার গলা, 'আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। খুনের বদলে খুন, জানের বদলে জান...'

'সন্তানহারা মায়ের বিলাপ,' বিড়বিড় করল মামুন। 'মি. বুকানি, আপনি কিছু মনে করবেন না।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'না. ব্যাপারটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। ঠিক আছে, বলুন, মি. মামুন–কি সাহায্য পেলে খুশি হন?'

'কি দরকার তা তো আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি,' বলল মামুন। 'অস্ত্র আমরাই যোগাড় করব, দরকার শুধু লাইসেন্স।'

'এখানে আসার আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' জানালেন জন বুকানি। 'তিনি লাইসেন্স দিতে নিষেধ করেননি। কাগজ-পত্র সবই আমি সঙ্গে করে এনেছি।' ব্রীফকেস খুলে সেগুলো বের করে মামুনের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'ভেরি গুড,' লাইসেন্স হাতে পেয়ে মৃদু হাসল মামুন। 'আমরা কৃতজ্ঞ, মি. বুকানি।'

'আমার কিছু কথা আছে, মন দিয়ে শুনুন,' রানাকে বললেন বুকানি। 'তার আগে বলুন, জঙ্গলে আপনারা কবে ঢুকতে চান?'

'কে বলল আমরা জঙ্গলে ঢুকব?'

ডেপুটি কমিশনার হাসলেন। 'আপনারা লেকে মাছ ধরতে আসেননি। মি. মামুন, যখনই কোন সমস্যা হবে, আমাকে ফোন করে জানাবেন।'

'অবশ্যই।'

রানা জানতে চাইল, 'বলছিলেন, আপনার কিছু কথা আছে–কি কথা?'

'জঙ্গলে ঢুকবেন বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বললেন জন বুকানি। 'পুলিসদের বলা আছে, ইনফর্মারদের পুরস্কার দেয়া যাবে না। কিন্তু সে নিষেধ আপনাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। জঙ্গলের কিছু লোক অত্যন্ত গরীব, স্বর্ণমুদ্রা পেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও মুখ খুলবে।'

'ধন্যবাদ, মি. বুকানি,' বলল রানা।

'আরেকটা কথা,' বললেন ডেপুটি কমিশনার। 'মি. মামুনকে শুধু আর্মস লাইসেন্স নয়, আরেকটা কাগজ দিয়েছি। তাতে সই করেছেন ওয়াইল্ডলাইভ অ্যান্ড ট্যুরিজম মিনিস্টার। কাগজটায় বলা হয়েছে, আপনারা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, কাজেই জঙ্গলে যদি কোন পোচারকে হাতি বা গণ্ডার শিকার রত দেখতে পান, খুন করার জন্যে গুলি করতে পারবেন।'

জন বুকানি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর লোটন নড্‌বেল রানাকে বলল, 'আকাশের সূর্য আজ পশ্চিম দিক থেকে ওঠেনি তো, দোস্ত?'

মামুনের দিকে তাকিয়ে রানা হাসছে। 'প্রশ্নটা বরং ওকে জিজ্ঞেস করো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মামুন বলল, 'ডেপুটি কমিশনার আমাকে পছন্দ করেন। রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলার রক্ষার কাজে ওদেরকে আমরা অনেক সাহায্য করি।'

মাথা নাড়ল নড্‌বেল। 'এর মধ্যে আরও কিছু আছে।'

'জন বুকানির মেয়ে আমার বান্ধবী,' বলল মামুন, আড়চোখে একবার রানার দিকে তাকাল। 'উনি হয়তো পাত্র হিসেবেও আমাকে অপছন্দ করেন না।'

নড্‌বেল আর রানা, দু'জনেই এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

হারারে থেকে বুলাওয়েইয়ো মাত্র এক ঘণ্টার ফ্লাইট। সকাল ন'টায় ল্যান্ড করল গালফস্ট্রীম। মেইন টার্মিনাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একজোড়া ল্যান্ড-রোভারের পাশে এসে থামল পাইলট। পুলিস কার-এর মাথায় আলো জ্বলছে। দ্বিতীয় ল্যান্ড-রোভারটা তোবড়ানো, গায়ে কাদা লেগে আছে। প্লেনের স্টুয়ার্ড সিঁড়ি নামিয়ে দিতে প্লেনে উঠে এল দু'জন লোক, দু'জনই কালো। একজন পুলিস ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম পরে আছে, দ্বিতীয় লোকটার পরনে স্থানীয় কৃষকের ঢোলা জোব্বা, আলখেল্লার মত দেখতে। কৃষক লোকটার হাতে বড় একটা ক্যানভাস ব্যাগ।

দু'জনকেই চেনে লোটন নড্‌বেল। তরুণ কৃষক তার চাচাতো ভাই, নুকুম্বে। নড্‌বেলের ফোন পাবার পর কালই স্থানীয় চোরাবাজার থেকে অস্ত্র কিনেছে সে। কয়েক বছর পর দেখা, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা।

ইন্সপেক্টরের বয়েস চল্লিশ, রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে। 'আমি টিকোলো, মি. রানা–জন টিকোলো। লোটন নড্‌বেল আমার ভাইয়ের বন্ধু।'

সেলুন টেবিলের ওপর তুলে ক্যানভাস ব্যাগটা খুলল নুকুম্বে। ডেপুটি কমিশনারের দেয়া কাগজের তাড়াটা পকেট থেকে বের করে ইন্সপেক্টরের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। লাইসেন্সের বিপরীতে অস্ত্রগুলো মেলাতে দশ মিনিট লাগল টিকোলোর। প্রতিটি কাগজে সই করল সে, তারপর বলল, 'মি. রানা। আপনি,

লোটন নড্‌বেল বা মি. মামুন যখনই যে অস্ত্র সঙ্গে রাখবেন, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সটাও পকেটে রাখতে ভুলবেন না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

রাইফেল আর পিস্তলগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন মিসেস ভ্যান্স। 'গড অলমাইটি! তোমরা মাত্র তিনজন লোক, এত অস্ত্র দিয়ে কি করবে?'

রানা ব্যাখ্যা করল। 'প্রতিটি অস্ত্রের আলাদা বৈশিষ্ট্য আর ভূমিকা আছে, মিসেস ভ্যান্স। সবগুলো আমরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, ব্যাপারটা তা নয়।' হাত তুলে দেখাল ও। 'ওটা একটা হাই-ভেলোসিটি রাইফেল, লং-রেঞ্জের জন্যে। পাশেই দেখতে পাচ্ছেন লাইটওয়েট পয়েন্ট টু-টু, সাইলেন্সার সহ। বাকি দুটো রাইফেল একে/ফরটিসেভেন, ক্লোজ-রেঞ্জের জন্যে। পিস্তলগুলো কোল্ট ১৯১১, লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ।' একটা একে/ফরটিসেভেন আর একটা পিস্তল ক্যানভাস ব্যাগে ভরল ও, সঙ্গে থাকল দুটো লাইসেন্স, তারপর নুকুম্বেকে বলল, 'প্লীজ, এগুলো যেন সন্ধের আগেই হারারেতে, মি. মামুনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।'

মাথা ঝাঁকাল নুকুম্বে। 'সন্ধের অনেক আগেই পেয়ে যাবেন তিনি।' কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ নামাল সে, ছুঁড়ে দিল নড্‌বেলের দিকে। 'কুডু হরিণের শুকনো মাংস।'

নড্‌বেলের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। ব্যাগের ভেতর হাত ভরে শুকনো মাংস বের করল সে। কিলো দুয়েক ওজন হবে, দেখতে শুকনো চামড়ার মত।

'ওই জিনিস মানুষ খায়?' নাক সিটকালেন মিসেস ভ্যান্স।

'জঙ্গলে পানি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না,' বলল রানা। 'লবণ দেয়া এই মাংস খেয়েই কয়েক হপ্তা টিকে থাকতে হবে আমাদের।'

নুকুম্বে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেন থেকে নেমে গেল।

রানাকে এক পাশে ডেকে এনে ইন্সপেক্টর টিকোলো জানতে চাইল, 'এখান থেকে আপনারা সরাসরি ভিক্টোরিয়া ফলস-এ যাচ্ছেন, তাই না, মি. রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নিজেও ওখানে যাচ্ছি, ওই এলাকায় মাসখানেক ডিউটি দিতে হবে।'

'নির্দেশটা কি হঠাৎ পেয়েছেন? ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে?'

'জ্বী, মি. রানা। কাল রাতে।'

'তিনি আপনাকে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠাচ্ছেন?'

মাথা নাড়ল টিকোলো। 'জ্বী-না। সেটা সময়ের অপচয় হবে। আমার মত মি. বুকানিও জানেন যে জঙ্গলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না আপনাদের। মি. বুকানি ওখানে আমাকে পাঠাচ্ছেন মি. মামুনের অনুরোধে, মিসেস ভ্যান্সের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিন্তু ওখানে তো রানা এজেন্সির কয়েকজন এজেন্টকে আগেই পাঠিয়েছে মামুন, ঠিক হয়েছে তারাই মিসেস ভ্যান্সের ওপর নজর রাখবে।'

'সাবধানের মার নেই, তাই মি. মামুন পুলিসের সাহায্যও নিচ্ছেন,' বলল

ইন্সপেক্টর।

'আপনি তাহলে ভিক্টোরিয়া ফলস-এ ডিউটি দেবেন?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়। ভিক ফলস আর ভিঙ্গা, এই দুই শহরে ঘোরাফেরা করব। দু'জায়গার স্টেশনেই রেডিও আছে, সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখব। প্রয়োজন হলে আপনারাও যোগাযোগ করবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনি কি এই প্লেনেই ভিক ফলস-এ যেতে চান?'

হেসে ফেলল ইন্সপেক্টর। 'চাই, আপনাদের যদি কোন অসুবিধে না হয়।'

'কিসের অসুবিধে!'

পনেরো মিনিট পর আকাশে উঠল প্লেন। টিকোলোকে নিয়ে পিছন দিকে বসে আছে রানা; স্থানীয় রাজনীতি, অর্থনীতি আর পোচিং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। লোটন নড্‌বেল বসেছে সেলুনে, মিসেস ভ্যান্স আর সিলভিয়ার সঙ্গে কফি খাচ্ছে। এক টুকরো হরিণের মাংস চিবাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন মিসেস ভ্যান্স, খবরের কাগজেও মন বসাতে পারছেন না। 'আপনারা জঙ্গলে ঢুকছেন কখন?' নডবেলকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কাল ভোরে।'

'সাইটে কখন পৌঁছুবেন?'

'পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।'

'মানে?'

'কত দ্রুত এগোতে পারব, তার ওপর।'

'গডড্যাম ইট! প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন মিসেস ভ্যান্স। 'কত দ্রুত এগোতে পারবেন, সেটা আপনার জানা নেই?'

'না। সাইটে পৌঁছুতে দু'দিন লাগতে পারে, পাঁচ দিনও লাগতে পারে।'

'কেন?'

'আমরা ট্র্যাক...ছাপ খুঁজব। জমিনের অবস্থার ওপর বহু কিছু নির্ভর করে। মাটি কতটুকু শুকনো, কোনদিকে বইছিল বাতাস, এখন কোনদিকে বইছে।'

সামনের দিকে এত বেশি ঝুঁকলেন মিসেস ভ্যান্স, মনে হলো হুইলচেয়ার থেকে পড়ে যাবেন। 'আমাকে ভুল বোঝাবেন না। পুলিসের সবগুলো রিপোর্ট পড়েছি আমি। ওদের ট্র্যাকার দিনের পর দিন এলাকাটা চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু কিছুই পায়নি।'

'মিসেস ভ্যান্স, আমরা কয়েক হপ্তার পুরানো ট্র্যাক খুঁজতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি তাজা ট্র্যাক পাওয়ার আশায়।'

'কেন?'

'কারণ, আপনার মেয়ে যখন খুন হয়, এলাকায় হয়তো আরও লোক ছিল–পরে তারা কি ঘটেছে দেখার জন্যে ফিরে আসতেও পারে।'

'ও, আচ্ছা। সিলভিয়া, আমাকে আরও এক কাপ কফি।'

তিন

সেবাঙ্গুয়ে নদীর উঁচু পাড়ে গুড়ি মেরে বসে আছে রানা, হাতের রাইফেল আলগাভাবে ধরা, তবে প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক। ওর সামনে নদী পেরুচ্ছে নড্‌বেল। এই মুহূর্তে বুক সমান পানিতে রয়েছে সে, মাথার ওপর তোলা হাতে দুটো রাইফেল। নদীর সারফেস আর উল্টোদিকের তীরে কুমীর আছে কিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ রাখছে রানা। আজ তিনদিন হলো জঙ্গলে ঢুকেছে ওরা। গোয়াই আর ম্লিবিজি নদী পিছনে ফেলে এসেছে, মার্ডার সাইটে পৌঁছবার আগে এটাই শেষ নদী পেরুতে হবে ওদেরকে। জিম্বাবুইয়ের জঙ্গল রানার পরিচিত, তবে এদিকটায় আগে কখনও দীর্ঘ সময় কাটায়নি, তাই ভাল করে দেখাও হয়নি। গত তিনদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে, এটাই হলো আসল আফ্রিকা। এলাকাটা সমতল নয়, ঢেউ খেলানো; এখানে-সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে ব্যাসল্ট পাথরের উঁচু-নিচু পাহাড়। শুকনো কালাহারি মাটিতে মোপানি জঙ্গল বেশ ঘন, গভীর বনভূমিই বলা চলে; ওগুলোর মাঝখানে ঘাস আর ঝোপে ঢাকা তেপান্তর, তা-ও ঢেউ খেলানো। নদীর অববাহিকা, বিশেষ করে উপত্যকা, বিভিন্ন জাতের গাছপালায় সমৃদ্ধ, তার মধ্যে কালো আবলুস আর বেওব্যাব গাছই বেশি।

জিম্বাবুইয়ের এদিকটা লোটন নড্‌বেলের পুরানো বিচরণ ক্ষেত্র, তার জন্মও এই এলাকায়। বোধহয় সেজন্যেই তার আচরণে অসতর্ক, অমনোযোগী একটা ভাব লক্ষ করে রানা। তিন দিন আগে ল্যান্ড-রোভার থেকে নামার পর, গাড়িটাকে ফিরে যেতে দেখার সময়, রানা ওর স্বভাববিরুদ্ধ একটা কাজ করে বসে। 'যুদ্ধক্ষেত্রে যতবার আমার সঙ্গে ছিলে তুমি, প্রতিবার আমিই ছিলাম তোমার লীডার,' নড্‌বেলের কাঁধে টোকা দিয়ে বলে ও। 'তবে যে-ক'দিন এদিকের জঙ্গলে আছি, তুমিই আমার বস্।'

সন্তুষ্টির হাসি হেসে নড্‌বেল জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। তবে লোকজনের সামনে আমাকে তোমার স্যার না বললেও চলবে।'

নড্‌বেল ঘুরছে, তার নিতম্বে একটা লাথি কষল রানা, তারপর ওরা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে জঙ্গলে ঢুকল।

অকুস্থলে পৌঁছানোর আগে কোন সূত্র পাবে বলে আশা করছে না; তবু সামনের জমিন প্রায় আঠার মত আটকে থাকল নড্‌বেলের দৃষ্টি, আর রানা চোখ রাখল চারপাশে। সঙ্গে তিনটে রাইফেল নিয়েছে ওরা—একটা হাই-ভেলোসিটি ৩০০.০৬, একটা একে/ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল, একটা লাইটওয়েট সিঙ্গেল—শট.২২। দলবদ্ধ পোচারদের সামনে পড়ে গেলে একে/ফরটিসেভেন কাজে লাগবে। ·২২-তে সাইলেন্সার লাগানো আছে, খরগোস বা ওই রকম ছোটখাট প্রাণী শিকার করার জন্যে ব্যবহার করা যাবে, যদি পাতা ফাঁদে ওগুলো ধরা না পড়ে।

·২২ ব্যবহার করতে হয়নি। প্রথম দুই সন্ধ্যায় নদীর কাছাকাছি গেইম-ট্র্যাকে ফাঁদ পেতেছিল নড্‌বেল। প্রথমবার একজোড়া খরগোস ধরা পড়ে, দ্বিতীয় দিন একটা বুশ-বাক বা ছোট হরিণ। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও ওদের সঙ্গে ছুরি আর কোমরে জড়ানো নাইলন রশি আছে। এক গাছের ডাল মাটিতে নামিয়ে এনে রশির সাহায্যে আরেক গাছের গোড়ায় বেঁধে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। ছুরি দিয়ে খরগোস আর হরিণের মাংস কেটে লবণ মাখায় ওরা, তারপর আগুনে পুড়িয়ে খায়। মাংস খুব একটা নরম করা যায়নি, তবু মনে হলো এত স্বাদের ডিনার জীবনে খুব কমই খেয়েছে।

শিকার করার মত প্রাণীর কোন অভাব নেই। ইম্পালা, জেব্রা আর জিরাফ অসংখ্য। মাঝে মধ্যে মোষও দেখা গেছে, তবে ওগুলোর কাছ থেকে সাবধানে দূরে সরে এসেছে ওরা। মুগ্ধ করা প্রাণী হলো কুডু; মাথার বাঁকা শিং যেন অলঙ্কার, রাজকীয় একটা ভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করে। গর্ভবতী হাতির একটা পালকে পাশ কাটিয়েছে ওরা। কাল বিকেলে দেখা পেয়েছিল একটা গণ্ডারের। ঘটনাটা ওদেরকে বিস্মিত করেছে। নড্‌বেলের জানামতে, পোচাররা এলাকার একটা গণ্ডারও রাখেনি। প্রথমে ওরা পায়ের ছাপ দেখতে পায়। সেই ছাপ এক ঘণ্টা অনুসরণ করার পর গণ্ডারটার সাক্ষাৎ মেলে। ওটাকে দেখে রাগে রানার গায়ে যেন আগুন ধরে যায়।

'না-না,' রানার ভুল ধারণা ভাঙার জন্যে ব্যাখ্যা করল নড্‌বেল। 'পোচাররা নয়, গেইম ডিপার্টমেন্টই ওটার শিং কেটে নিয়েছে।'

'সেকি! কেন?'

'জাম্বিয়া থেকে পোচাররা এসে গণ্ডার মেরে শিং নিয়ে যায়,' বলল নড্‌বেল। 'ওগুলোকে বাঁচাবার জন্যেই জিম্বাবুই সরকারের নির্দেশে গেইম ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি গণ্ডারের শিং কেটে নিয়েছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'তবে তাতেও কোন লাভ হয়নি। পোচাররা এখনও গণ্ডার মারছে।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা। 'শিং না পেলে মেরে কি লাভ?'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল নড্‌বেল, আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কারণ দুটো। এক, ওই বিশেষ গণ্ডারটির পিছু নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে সময় নষ্ট করতে না হয়। পিছু নিয়ে একটা গণ্ডারের কাছাকাছি আসতে অনেক সময় কয়েকদিনও লেগে যায়। দুই, পোচারদের বসরা শিংঅলা গণ্ডার মারতে যে টাকা দেয়, শিংবিহীন গণ্ডার মারতেও ওই একই টাকা দেয়।'

'কিন্তু কেন?'

'ব্যাখ্যাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, তবে সত্যি ও সহজ। মাত্র পাঁচ বছর আগে দু'হাজারেরও বেশি কালো গণ্ডার ছিল জিম্বাবুইয়েতে। এখন আছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশটা। এই সাড়ে তিনশোর অর্ধেক গণ্ডারকে প্রাইভেট ল্যান্ডে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

'গণ্ডার মারার জন্যে পোচারকে যারা টাকা দেয় তাদের কাছে প্রচুর শিং আছে, কিন্তু জ্যামিতিক হারে দাম বাড়ানোর জন্যে সেই শিং বা শিং থেকে তৈরি পাউডার খুব অল্পই বিক্রি করা হয়। এখন তারা চাইছে দুনিয়ার বুক থেকে কালো

গণ্ডার পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাক। যেদিন তা ঘটবে, গণ্ডারের শিং হয়ে উঠবে সোনার হরিণ। ফার ইস্ট-এ দশ গ্রাম পাউডার নাইন-ক্যারেট নির্ভেজাল সাদা হীরের চেয়ে বেশি দামে বিকোবে। সরকারী হিসাবে, ওই বেজন্মাদের কাছে প্রায় পাঁচ টন পাউডার আছে। এরচেয়ে নোংরা ব্যবসা আর হয় না, রানা।'

এক সময় দেখতে সুন্দর ছিল গণ্ডারটা, শিং কেটে নেয়ায় শুধু যে সৌন্দর্য হারিয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে ভারসাম্যও হারিয়েছে। দেখে মায়া লাগছে রানার, সেই সঙ্গে রাগও বাড়ছে। 'একটা শিঙের জন্যে কত পায় পোচাররা?'

'গড়ে পাঁচশো ডলার। জাম্বিয়ায় একজন মানুষের বাৎসরিক আয়ের সমান,' বলল নড্‌বেল। 'তবে ঝুঁকি খুব বেশি। বনরক্ষীদের খুন করার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। পোচাররা মারাও পড়ে। কিন্তু সমস্যা হলো, গেইম ডিপার্টমেন্টের লোকবল খুব কম। ওদেরকে মাত্র একটা হেলিকপ্টার দেয়া হয়েছে, গোটা দেশের জঙ্গলের ওপর নজর রাখার জন্যে।'

দুর্ভাগা প্রাণীটার দিকে পিছন ফিরল ওরা। রানা বলল, 'পোচারদের দেখতে পেলে গুলি করব আমরা—খুন করার জন্যে। তোমার সঙ্গে লাইসেন্স আছে।'

'দেখতে পাবার সম্ভাবনা কম,' বলল নড্‌বেল। 'তারা আরও পশ্চিম দিকে অপারেশন চালায়। আমরা যেটাকে পিছনে ফেলে এলাম, এই এলাকায় সে কোন সঙ্গিনী খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ বংশ বিস্তারের কোন আশা নেই, এমনিতেই অস্তিত্ব হারাবে।'

রানা বলল, 'একটা যখন আছে, আরও একটা থাকতে পারে—অন্তত আশা করতে দোষ কি।'

নদীর ওপারে পৌঁছে ·২২-টা বাম কাঁধে ঝোলাল নড্‌বেল। পিছন দিকে না তাকিয়ে ঝোপের ফাঁক গলে সামনে এগোল, একে/ফরটিসেভেনটা বাগিয়ে ধরে আছে। রানা জানে, নড্‌বেল এখন নিশ্চিত হতে চাইছে; নদী পেরিয়ে ও যেখানে উঠবে সেখানে বা আশপাশে কোথাও কোন বিপদ ওত পেতে নেই। ভয় শুধু সশস্ত্র লোকজনকে নয়, হিংস্র প্রাণীরাও পানি খাবার জন্যে এদিকে আসতে পারে।

প্রায় পনেরো মিনিট পর নদীর তীরে ফিরে এল নড্‌বেল। পানিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে কুমীর আছে কিনা দেখে নিয়ে ইঙ্গিত করল রানাকে।

মার্ডার সাইট থেকে তখনও পনেরো কিলোমিটার দূরে ওরা, প্রথম ছাপ চোখে পড়ল। উবু হয়ে বসে দীর্ঘ কয়েক মিনিট শুকনো মাটি পরীক্ষা করল নড্‌বেল। রানা বসেনি, চারপাশে তীক্ষ্ণ চোখ বুলাচ্ছে। এক সময় সিধে হয়ে বৃত্তাকারে চক্কর দিতে শুরু করল নড্‌বেল, প্রতিবার বৃত্তটা আরও বড় হচ্ছে। তারপর আবার উবু হলো সে, হাত-ইশারায় কাছে ডাকল রানাকে। আঙুল তাক করে লক্ষণ বা চিহ্নগুলো দেখাল—শুয়ে পড়া ঘাস, ভাঙা ডাল, এলোমেলো মাটি। 'কাল রাতে এখানে ওরা ক্যাম্প ফেলেছিল,' বলল সে। 'দু'জন লোক। কালো।'

'কালো বুঝলে কিভাবে?'

'গাড়ির টায়ার কেটে তৈরি স্যান্ডেল ছিল পায়ে।' মাটিতে ফুটে থাকা নকশা দেখাল নড্‌বেল। 'শ্বেতাঙ্গ হলে আমাদের মত বুশ বুট পরে থাকত।

ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জারও নয়, কারণ তারাও বুট পরে। এদের টাকা নেই, থাকলে অন্তত বুট না হলেও জুতো পরত।'

'গণ্ডার শিকারী?'

'মনে হয় না। গণ্ডার শিকারীরা জিম্বাবুইয়ের লোক হোক বা মোজাম্বিক থেকে আসুক, সাধারণত আর্মি বুট পরে। এরা দু'জন সম্ভবত স্থানীয় পোচার, মাংস আর চামড়ার লোভে এসেছে। এদের কাছে অনেক সময় রাইফেলও থাকে না, ফাঁদ পেতে শিকার ধরে।' ডান দিকে হাত তুলল নড্‌বেল। 'ওদিকে, প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে, বাটোংকা গ্রাম। ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওদিক থেকেই এসেছে তারা। যাচ্ছে লেকের দিকে। ওদের গন্তব্য সম্ভবত মার্ডার সাইটের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে।'

'আপাতত তুমিই টীম লীডার,' বলল রানা। 'বলো কি করা উচিত।'

সিধে হয়ে হাতঘড়ি দেখল নড্‌বেল। ঘুরে বাম অর্থাৎ লেকের দিকে মুখ করল। 'নদীর উজান, অর্থাৎ গ্রামটা থেকে এসে থাকলে ধরে নিতে হয় এদিকে নিয়মিত শিকার করে তারা, এলাকাটা ভালভাবে চেনে। জেসিকা আর সাইফুর খুন হবার সময়, আগে-পরে, কিছু একটা দেখেও থাকতে পারে। এরা যে ধরনের পোচার, খেয়ে-পরে কোনরকমে জীবন ধারণ করে। যদি কিছু ঘটতে দেখে, বা ঝড়-বৃষ্টির আগে কোন ছাপ টপকায়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারবে। বাটোংকা হলে সহজে মুখ খুলতে চাইবে না, তবে দু'একটা স্বর্ণমুদ্রা দেখালে গান গাওয়ানোও সম্ভব বলে মনে করি।'

'চলো তাহলে, গান গাওয়াই,' বলল রানা। 'ওদের ছাপ খুঁজে পাবে?'

মাথা ঝাঁকাল নড্‌বেল। 'সাবধানেই এগিয়েছে ওরা, তবে পিছু নিতে অসুবিধে হবে না। টেকনিকটা তোমার মনে আছে?'

'অবশ্যই,' বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর পাঁচ ঘণ্টা দিনের আলো পাব। চলো, রওনা হই।'

মোপানি গাছের একটা ডাল ভাঙল নড্‌বেল, প্রায় এক মিটার লম্বা, ছুরি দিয়ে শাখা আর পাতা ছেঁটে ফেলে সামনে বাড়ল। পঞ্চাশ মিটার এগোবার পর রানা পিছু নিল, নড্‌বেলের প্রতিটি নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। এই ট্র্যাকিং পদ্ধতি একজোড়া লোকের জন্যে আদর্শ। সামনের ছাপ খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছে নড্‌বেল, হাতের লাঠি দিয়ে অস্পষ্ট চিহ্নগুলো রানাকে দেখাচ্ছে। একগোছা ঘাস একদিকে নুয়ে আছে, মাটিতে স্যান্ডেলের নকশা ফুটে আছে, গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো ডাল স্থানচ্যুত হয়েছে–এ-সবই দিক নির্দেশক। যখন কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না, শেষ চিহ্নের পাশে সরে দাঁড়াচ্ছে রানা, ওকে ঘিরে চারপাশে বৃত্ত তৈরি করছে নড্‌বেল ছাপের খোঁজে। পরবর্তী দু'ঘণ্টায় এরকম দু'বার ঘটল ব্যাসল্ট পাথরের বিস্তৃতির ওপর, নরম মাটিতে আবার ছাপ খুঁজে বের করতে কয়েকশো মিটার দীর্ঘ বৃত্ত তৈরি করে ঘুরতে হলো নড্‌বেলকে। ট্র্যাকার হিসেবে রানার নিজের ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা কম নয়, তারপরও এই দু'ঝার নড্‌বেলের নৈপুণ্য মুগ্ধ করল ওকে।

তিন ঘণ্টা পর থামল নড্‌বেল। বসল সে, মাটির কাছাকাছি চোখ নামিয়ে

ভাল করে পরীক্ষা করল সামনের জমিন। খানিকটা ধুলো নিল, নাকের কাছে তুলে শুঁকল, তারপর ঝরে পড়তে দিল আঙুলের ফাঁক গলে। হাত-ইশারায় রানাকে কাছে ডাকল সে। 'এখানে থেমে পেশাব করেছে। খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক আগে। আমরাও তাই করব।'

'কেন?' রানা খানিকটা অধৈর্য।

ব্যাখ্যা করল নড্‌বেল। 'কারণ দশ মিনিট আগে একটা তিতির পাখিকে চমকে দিয়েছি আমরা, চিৎকার দিয়ে ডাল ছেড়ে উড়ে যায় ওটা। তার পাঁচ মিনিট আগে একদল বেবুনকে বিরক্ত করেছি—ওদের চিৎকারও অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেছে। পঁচিশ মিনিট আগে একটা হানি-গাইড পাখি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে একটা মৌচাকে নিয়ে যাওয়া। ওটার চিৎকারও অনেক দূর থেকে শোনা গেছে। সামনের ছোকরা দু'জন যদি অভিজ্ঞ হয়, এ-সব চিৎকার আর ডাক শুনে আমাদের অস্তিত্ব আর গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ হয়ে গেছে। কাজেই আধঘণ্টার জন্যে থেমে ওদের মন থেকে সন্দেহ দূর করা দরকার।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'সত্যি তুমি লীডার হওয়ার উপযুক্ত, লোটন।'

নড্‌বেলও হাসল। 'এ-সব আমাকে ঠেকে শিখতে হয়েছে, দোস্ত। শিখতে পেরেছিলাম বলেই তিন বছরের যুদ্ধে মারা পড়িনি।'

মাটির রঙ এক জায়গায় গাঢ়, যেখানে প্রস্রাব করা হয়েছে। সেদিকে আঙুল তুলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'লোকগুলো সশস্ত্র বলে মনে করো?'

শর্টসের চেইন খুলে পেশাব করছে নড্‌বেল। 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে অস্ত্র সহ গেইম রেঞ্জারদের হাতে ধরা পড়লে অতিরিক্ত পাঁচ বছর জেল খাটতে হবে।'

'এদিকের লোকজন তো নড্‌বেল ভাষায় কথা বলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার ভাষায়,' বলল নড্‌বেল। 'তবে সবাই নয়। যে ভাষাতেই কথা বলুক, কমবেশি বুঝব আমি।'

সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা আগে ওদেরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল ওরা।

পাখিদের বিরক্ত করায় আবার আধঘণ্টা করে দু'বার থামল নড্‌বেল। রানা ধৈর্য হারায়নি, বরং বন্ধুর সতর্কতা আর নৈপুণ্য দেখে মনে মনে প্রশংসা করল—লাঠি তাক করে যে ছাপ ওকে দেখাল সে, এত অস্পষ্ট যে দেখিয়ে না দিলে চোখে পড়ার কথা নয়।

লেকের কিনারা থেকে আর মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে রয়েছে, এই সময় নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল ওরা।

'লেকের কিনারা পর্যন্ত যাবে না ওরা,' বলল নড্‌বেল। 'আমার ধারণা, ইতিমধ্যে এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে ক্যাম্প ফেলেছে। গেইম ট্রেইলে ফাঁদ পাতবে, এই মুহূর্তে হয়তো সেই কাজেই ব্যস্ত।'

'ফাঁদ পেতে আশপাশে লুকিয়ে থাকবে?'

মাথা নাড়ল নড্‌বেল। 'ক্যাম্পে ফিরে যাবে। দু'জন চারটে করে ফাঁদ

পাতবে, আলাদা জায়গায়। ক্যাম্প থেকে ঠিক সন্ধের আগে বেরুবে আবার, ফাঁদে কিছু পাওয়া গেলে নিয়ে আসবে ক্যাম্পে।'

'ক্যাম্পটা কোথায় ফেলবে?'

'কোন গর্তে বা নিচু জমিনে, যাতে আগুন জ্বাললে দূর থেকে দেখা না যায়।'

'আমরা এখন তাহলে কি করব?'

'আমরা কাজ শুরু করব ঠিক সন্ধের আগে। প্রথমে আমি যাব, শুধু শর্টস পরে, অস্ত্র ছাড়াই। ৩০০.০৬ নিয়ে আমাকে তুমি কাভার দেবে। আমি কোনাকুনি যাব, ফলে গুলি করার জন্যে খোলা জায়গা পাবে তুমি।'

দু'ঘণ্টা পর ইম্পালার পোড়া নিতম্ব চিবাচ্ছে রানা, আগুনের ধারে বসা দুই পোচারের সঙ্গে কথা বলতে শুনছে নড্‌বেলকে।

সূর্য অস্ত যাবার সময় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে শুয়ে ছিল ওরা, দেখল দু'জন বাটোংকা আদিবাসী নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে আসছে। একজনের কাঁধে একটা ইম্পালা, আরেকজনের হাতে ছোট আকৃতির দুটো বুশ-বাক। যে লোকটার কাঁধে ইম্পালা রয়েছে, তার বাম হাতে একটা রাইফেল। পাথরের ওপর শুয়ে লোকগুলোকে হরিণের চামড়া ছাড়াতে দেখল ওরা। ছাড়ানো চামড়াগুলো কাছাকাছি একটা গাছের ডালে শুকোবার জন্যে ঝুলিয়ে রাখা হলো। ওই গাছেরই গোড়ায় রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল একজন।

আগুন জ্বালছে পোচাররা, রাইফেল দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল নড্‌বেল, গা থেকে শার্ট খুলে পাথর থেকে নেমে পড়ল। একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে আগুনটার দিকে এগোল সে, হাত দুটো শরীরের পাশ থেকে যথেষ্ট দূরে। ঝোপ থেকে ছিটকে সরে গেল একটা হায়েনা, তখনই তাকে দেখতে পেল লোক দু'জন। ক্ষিপ্রবেগে একজন ছুটল গাছটার দিকে, রাইফেলটা দরকার।

ছুটন্ত লোকটাকে ৩০০.০৬-এর সাইটে ধরে রেখেছে রানা, তবে গুলি করার প্রয়োজন হলো না। বাটোংকা ভাষায় কথা বলে উঠল নড্‌বেল। হাত দুটোও কাঁধের দু'পাশে লম্বা করে দিল। ছুটন্ত লোকটা ইতিমধ্যে গাছের কাছে পৌঁছে গেছে, রাইফেলও হাতে নিয়েছে, তবে ব্যারেলটা তোলেনি—মাজল মাটির দিকে তাক করে রেখেছে। নরম সুরে আশ্বাস দিচ্ছে নড্‌বেল, ধীর পায়ে সামনে এগোচ্ছে।

জানা গেল দুই ভাই তারা। কর্তৃপক্ষকে ওদের সম্পর্কে রিপোর্ট করা হবে না, এ-কথা শুনে নড্‌বেল আর রানাকে খাতির করে বসাল, এক্স-আর্মি রাকস্যাক থেকে ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা পাউচ বের করে ধরিয়ে দিল ওদের হাতে, পাউচে কলা পচিয়ে বানানো সুরা আছে।

তিনজন মিলে পাউচ খালি করে ফেলল ওরা। রানা এ-সব খায় না শুনে দুই ভাই অবাক হলেও কোন মন্তব্য করল না। রানা যাতে বুঝতে পারে, প্রতিটি বাক্য ভাষান্তর করছে নড্‌বেল।

'একটা সাদা মেয়ে আর একটা শ্যামলা ছেলে কয়েক হপ্তা আগে এখান থেকে কাছাকাছি একটা জায়গায় খুন হয়েছে, সেজন্যেই আসতে হলো

আমাদের।'

বড় ভাইয়ের বয়েস হয়েছে, পাক ধরেছে মাথার দু'পাশের চুলে, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'খারাপ, অত্যন্ত ক্ষতিকর, এমন কি আমাদের জন্যেও বিপজ্জনক। এলাকায় পুলিস আর ট্র্যাকার গিজগিজ করছিল, অন্তত দুই হপ্তা আমরা এদিকে পা ফেলতেই পারিনি।'

'শিকার করাই কি তোমাদের একমাত্র পেশা?' জানতে চাইল নড্‌বেল।

বড় ভাই মাথা নাড়ল। 'পেশা বলাটা ভুল। মাংস তো পানির দরে বেচতে হয়, আর বুলাওয়েও থেকে মাসে মাত্র একবার এক লোক এসে চামড়া নিয়ে যায়। ভাল একটা ইম্পালা চামড়ার জন্যে মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট দেয়, অথচ বুলায়ওয়েওতে নিয়ে গিয়ে সেটাই বিক্রি করে তিন ডলারে।'

'ওরা নিজেরা কেন বুলাওয়েওতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে না?' জানতে চাইল রানা।

'ওখানে যেতে দু'ডলার বাস ভাড়া লাগে, যেতে আসতে সময়ও লাগে দু'দিন। তারপরও ঝামেলা আছে, ডিলার অর্থাৎ ক্রেতাকে খুঁজে বের করতে হবে।' বড় ভাইয়ের দিকে ফিরল নড্‌বেল। 'ওদেরকে কে বা কারা খুন করতে পারে, তোমার কোন ধারণা আছে?'

লোকটা মাথা নাড়ল, কপালে চিন্তার দুটো ভাঁজ। আড়চোখে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল একবার। দু'জনেই বেশ নার্ভাস। 'আমরা কিছুই জানি না। পুলিস আমাদের গ্রামে এসে সবাইকে জেরা করেছে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি।'

'আমরা পুলিস নই,' বলল নড্‌বেল। 'যদি কোন তথ্য পাই, পুলিসকে তা জানাবও না।'

বড় ভাই আবার মাথা নাড়ল। 'আমরা কিছু দেখিনি, কিছু শুনিওনি। সে-সময় এলাকায় ছিলাম না। পুলিস ট্র্যাকার নিয়ে এসেছিল। তারা কোন ছাপ খুঁজে পায়নি, কারণ পরদিন সকালে খুব জোরাল বৃষ্টি হয়–ইতিমধ্যে খুনী কেটে পড়েছে।'

নড্‌বেল বাক্যটা যখন ভাষান্তর করছে, রানার মাথায় কি যেন একটা ধরা পড়ল। নড্‌বেলের কব্জিতে টোকা দিল ও, বলল, 'ঠিক শুনেছ, খুনী শব্দটা ব্যবহার করল লোকটা–'খুনীরা' নয়?'

'হ্যাঁ। খুনী।'

আগুনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'তোমার অভিজ্ঞতা কি বলে, কতদিন পরপর জঙ্গলে শিকার করতে আসে ওরা?'

'প্রায়ই আসে। আর শুধু এই নির্দিষ্ট এলাকাতেই। কারণ, গ্রামে আরও কিছু পোচার আছে, তারাও নিজেদের এলাকার বাইরে যায় না। এই নিয়ম আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।'

'আর পোচারদের সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো হিউম্যান ট্র্যাক-এর সন্ধানে থাকা, তাই না? গেইম রেঞ্জারদের হাতে ধরা পড়লে জেলে পচতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

কোমরে হাত দিয়ে বেল্ট থেকে ছোট চামড়ার পাউচটা বের করল রানা, ভেতরে স্বর্ণমুদ্রা আছে। চকচকে হলুদ একটা মাত্র মুদ্রা ছুঁড়ে দিল আগুনের ওপারে। দুই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ল সেটা।

আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে ওটা, দুই ভাইয়ের কেউই চোখ ফেরাতে পারছে না। একটা স্বর্ণমুদ্রা মানে পাঁচ বছরের আয়। একযোগে, ধীরে ধীরে, মুখ তুলে নড্‌বেলের দিকে তাকাল তারা।

'মদ আর মাংসের দাম,' বলল নড্‌বেল।

দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ছোট ভাই জানতে চাইল, 'এখানে আপনাদের কে পাঠিয়েছে?'

'মেয়েটার মা,' বলল নড্‌বেল। 'দশ লাখ গরুর মালিক তিনি।' আঙুল তুলে স্বর্ণমুদ্রাটা দেখাল। 'আর ওগুলো...তাও দশ লাখের কম হবে না। তিনি তাঁর মেয়ের খুনীকে শাস্তি দিতে চান।'

আগুনে বাতাস লাগায় শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে হায়েনার হাসি। আপনমনে ইস্পালার নিতম্ব চিবাচ্ছে রানা, যেন দুনিয়ার কোন ব্যাপারে এতটুকু মাথাব্যথা নেই। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর, ধীরে ধীরে, হাত বাড়িয়ে স্বর্ণমুদ্রাটা হাতে নিল বড় ভাই, খাকি শর্টসের পকেটে সাবধানে গুঁজে রাখল। আবার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। ছোট ভাই সায় দিয়ে মাথাটা এত সামান্য কাত করল, সত্যি কাত করেছে কিনা সন্দেহ হলো নড্‌বেলের।

বড় ভাই বলল, 'এক লোকের কথা জানি, বহু বছর ধরে এদিকেই শিকার করছে। লেপার্ড আর চিতা শিকার করে, আর শিকার করে...আর কি শিকার করে জিজ্ঞেস করবেন না। না, টাকার জন্যে নয়–শিকার করা তার নেশা। তার ছাপ আমরা চিনি। সে দামী সিগারেটও খায়।'

'সে কি আফ্রিকান?' জিজ্ঞেস কলল নড্‌বেল। 'মানে কালো?'

'না, কালো নয়,' বলল বড় ভাই। হাত তুলে বাম দিকটা দেখাল। ওদিকে লেক আছে। 'ওদিক থেকে আসা-যাওয়া করে সে।'

রানার দিকে ফিরল নড্‌বেল। 'শ্বেতাঙ্গ এক লোক, বিঙ্গা থেকে আসে। এরা যতটুকু বলছে, তারচেয়ে অনেক বেশি জানে। জিম্বাবুইয়ের জঙ্গলে শ্বেতাঙ্গদের সাংঘাতিক দাপট। যার কথা বলছে, সে শুধু লেপার্ড আর চিতা নয়, মানুষও শিকার করে, কাজেই তাকে এরা ভয় পায়। দামী সিগারেট একমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই খায়।'

'তাকে ওরা দেখেছে,' বলল রানা।

'অবশ্যই।'

'স্বীকার করাও,' নির্দেশ দিল রানা।

বড় ভাইয়ের দিকে ফিরে নড্‌বেল বলল, 'লোকটাকে তোমরা দেখেছ।'

'বিঙ্গার পিছনে খোঁজ নিন,' বলল বড় ভাই। 'তবে খুব বেশি পিছনে নয়। এই পাঁচ কিলোমিটার।'

কথাগুলো ভাষান্তর করল নড্‌বেল, তারপর যোগ করল, 'বিঙ্গায় স্থায়ীভাবে

খুব কম শ্বেতাঙ্গই বসবাস করে। আমেরিকান পীস কোর-এর কিছু লোক, কিছু মিশনারি, হাসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার। বিঙ্গার পাঁচ কিলোমিটার পিছনে কয়েকটা হলিডে কটেজ আছে, মালিক বুলাওয়াওয়ের কয়েকজন কোটিপতি শ্বেতাঙ্গ। হলিডে কটেজ ছাড়া আর আছে বিশ-পঁচিশটা খামার–কয়েকটা শ্বেতাঙ্গ পরিবার কুমীর পালে। কারও কারও ফিশিং লাইসেন্সও আছে। ওখানে লোকটাকে পাব বলে আশা করছি।'

'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'দিন দুই।'

'তাহলে ভোরে রওনা হব আমরা,' বলল রানা।

চার

গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে ডক্টর খোদাবক্স নিহত হবার কয়েক হপ্তা পর তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগী খুন হয়ে গেল, একই দিনে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেল আন্ডারগ্রাউন্ডের ছয়জন কুখ্যাত অপরাধীর লাশ। জেসিকা-সাইফুর জোড়া খুনের সঙ্গে এ-সব ঘটনার সম্পর্ক আছে, কাজেই তদন্ত হওয়া দরকার–হারারেতে মামুনকে রেখে যাবার পিছনে এটাই ছিল রানার যুক্তি।

রাজধানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা এখনও শ্বেতাঙ্গরা নিয়ন্ত্রণ করে, তবে ট্রেড ইউনিয়ন ও অপরাধ জগৎ পুরোপুরি কালোদের দখলে। এই জগতের সবচেয়ে বড় উপাধি হলো 'সম্রাট'। দু'একজন রাজনীতিক, দু'তিনজন সাংবাদিক আর উঠতি সম্রাট সহ সব মিলিয়ে বিশ-পঁচিশজন লোককে খুন করে ধরা না পড়লে আন্ডারগ্রাউন্ডে তাকে নতুন সম্রাট বলে গ্রহণ করা হয়। ড্রাগ, অস্ত্র ও দেহ-ব্যবসার মাধ্যমে বিশ-পঁচিশ কোটি টাকা কামাতে পারলেও এই উপাধি পাওয়া যায়। হারারে সম্রাটদের প্রত্যেকেরই বৈধ ব্যবসায়িক ফ্রন্ট আছে–অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপ-এর মালিক, ড্রাগ ব্যবসায়ীদের আছে ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানী, অনেকদল সিকিউরিটি সার্ভিস-এর নামে মার্সেনারি ভাড়া খাটায়, স্মাগলাররা খুলে বসেছে ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট বা ইনডেন্টিং ফার্ম।

মামুন দু'জন ইনফর্মারকে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল কি ধরনের তথ্য তার দরকার। তারপর একজনকে পাঠাল এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপগুলোয় ঢুঁ মারার জন্যে, আরেকজনকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বলল নিহত মার্সেনারিরা কোন সিকিউরিটি সার্ভিস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা।

দু'দিন পর প্রথমজন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। আর্মস ডিলারদের কেউ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গান বিক্রির কথা স্বীকার করেনি।

দ্বিতীয় ইনফর্মার ফিরে এসে অদ্ভুত এক গল্প শোনাল মামুনকে। বিভিন্ন সিকিউরিটি সার্ভিস ও ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিতে পরিচিত লোক আছে তার, তাদের সঙ্গে দেখা করে নিহত মার্সেনারিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিল

সে। দ্বিতীয় দিন পাঁচ-ছ'টা কোম্পানীতে যায়, কোন তথ্য না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল, এই সময়-অচেনা এক লোক রাস্তায় থামায় তাকে, হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে লোকজনের ভিড়ে মিশে যায়।

কাগজটা চেয়ে নিয়ে মামুন দেখল তাতে একটা মাত্র লাইন লেখা–'আঙ্কেল, কাল সকাল এগারোটায় সিটি টাওয়ারের ফিফথ ফ্লোরে নির্দ্বিধায় চলে আসুন, ড্যাডি আপনাকে সাহায্য করবেন–টুইংকল।'

ইনফর্মারকে বিদায় করে দিয়ে হাতের তালুতে চিবুক ঠেকিয়ে চিন্তা করতে বসল মামুন। চোখ বুজলে এখনও রোমহর্ষক দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পায়। এক বছর আগের ঘটনা, হারারের নামকরা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর 'সিংহানি'-তে বই কিনতে গিয়েছিল সে। বিশাল স্টোর, মাঝামাঝি জায়গায় বুক সেকশন। মামুন যখন ঢোকে, ভেতরে প্রচুর লোকজন ছিল। সময়ের হিসাব রাখেনি, বই আর পত্রিকা বাছাই করতে মগ্ন হয়ে পড়ে সে। এক সময় হঠাৎ প্রায় চমকে উঠে খেয়াল করল, বুক সেকশনে সে ছাড়া আর কেউ নেই। হাতঘড়ি দেখল, মাত্র সন্ধে সাতটা। ঠিক এই সময়টায় বুক সেকশনে ক্রেতারা ভিড় করে। এক ঘণ্টা আগে সে যখন এই প্যাসেজে আসে, প্রায় বিশ-পঁচিশজন লোক ছিল। তারা তো কেউ নেইই, পরবর্তী প্যাসেজগুলোতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কান পাতল মামুন। গোটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে বই না নিয়েই কাউন্টারের দিকে ফিরতে শুরু করে সে। বুক সেকশন পিছনে ফেলে ডল অ্যান্ড টয় সেকশনে পা দিয়েছে, হঠাৎ সামনের কোন একটা প্যাসেজ থেকে পিস্তলের গুলি হলো। একটা কোণ থেকে উঁকি দিয়ে সেদিকে তাকাতেই কালো সুট পরা দু'জন লোককে প্যাসেজের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল মামুন, দু'জনেরই বুকে গুলি লেগেছে। পিছিয়ে আসতে যাবে মামুন, সাত কি আট বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে এক গাদা খেলনার পিছন থেকে বেরিয়ে এল, দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে তার দিকে, আতঙ্কে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'আঙ্কেল, আমাকে বাঁচান!' বলে মামুনকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। এক ঝটকায় তাকে বুকে তুলে নিয়ে ছুটল মামুন, বুক সেকশনের দিকে ফিরে আসছে।

পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে হিংস্র গলার নির্দেশ, 'যে-ক'টা লাশ পড়ে পড়ুক, মেয়েটা যেন পালাতে না পারে!'

বুক সেকশনে পৌঁছুতে পারেনি মামুন, তার আগেই আবার গুলির শব্দ হলো।

কে যেন বলল, 'বাইরে আরও বডিগার্ড ছিল, তারা ভেতরে ঢুকে পড়েছে!'

উত্তর এল, সংখ্যায় আমরা বেশি···মেয়েটাকে পেলে বেরিয়ে যাওয়া কোন সমস্যা নয়। তবে তাড়াতাড়ি! সানডে খবর পেলে দশ মিনিটের মধ্যে তার গোটা বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যাবে।'

কি ঘটছে এতক্ষণে আন্দাজ করতে পারল মামুন। সানডে হারারে আন্ডারগ্রাউন্ডের একজন সম্রাট। বাচ্চা মেয়েটা সম্ভবত তারই কন্যা। প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সম্রাটের লোকজন মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতে এসেছে। যেভাবেই হোক আগেভাগে খবর পায় তারা, বডিগার্ডদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি সিংহানিতে কিছু কিনতে আসবে। ভেতরে ঢুকে এদিক সেদিক পজিশন নিচ্ছিল, ক্রেতারা বিপদ

টের পেয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়েছে। খবর পেলেও, সম্রাটদের প্রতিশোধ পাল্টা-প্রতিশোধ গ্রহণের এই যুদ্ধে পুলিস ভুলেও নাক গলাতে আসবে না।

ছুটে বুক সেকশনে চলে এল মামুন। ইতিমধ্যে তার হাতেও একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। কুখ্যাত একজন ক্রিমিন্যাল-এর মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়াটা উচিত হচ্ছে কিনা, এই চিন্তাটা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিল। বুট পরা পায়ের শব্দ ছুটে আসছে দু'দিক থেকে। পালাবার পথ খুঁজছে মামুন। মেয়েটা ওর গলা আর ঘাড় দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। পালাবার কোন পথ নেই, বুঝতে পেরে বুক শেলফে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। ঠিক তখনই চোখে পড়ল মইটা। প্যাসেজে একটাই মই, উঠে গেছে শেলফগুলোর মাথা ছাড়িয়ে চওড়া একটা কংক্রিটের কার্নিসে, সেখানে সারি সারি সাজানো রয়েছে কাঠের বাক্স।

তর তর করে বাক্সগুলোর মাথায় উঠে এল মামুন, মইটাও টেনে তুলে নিল। বাক্সগুলোর পিছনে সরু খানিকটা জায়গা দেখা গেল, মেয়েটিকে নিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকল। নিচের প্যাসেজ হয়ে ছুটে গেল কয়েক জোড়া বুট। তারপর আবার গোলাগুলি শুরু হলো।

দশ মিনিট পর থামল বন্ধুকযুদ্ধ। কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ভেতর। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিল মামুন, জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার?'

'টুইংকল।'

'টুইংকল, মা-মণি, বিপদ কেটে গেছে, আর কোন ভয় নেই...'

'আঙ্কেল, আমি বাড়ি যাব,' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল মেয়েটা।

'আমি তোমাকে থানায় পৌঁছে দিলে, পুলিস তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসবে–ঠিক আছে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে।'

মইটা নিচে নামাল মামুন, টুইংকলকে বুকে নিয়ে নেমে এল নিচে। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত চারদিক থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল কালো সুট পরা পাঁচ-সাতজন দৈত্য–কারও হাতে মেশিন পিস্তল, কারও হাতে অটোমেটিক রাইফেল। 'হল্ট!' তাদের একজন নির্দেশ দিল। 'হাতের পিস্তল ফেলে মেয়েটাকে মেঝেতে নামাও!'

মামুন ইতস্তত করছে দেখে টুইংকল ওর কানে ফিসফিস করল, 'ওরা ড্যাডির লোক, আংকেল।'

হাতের পিস্তল ফেলে ধীরে ধীরে মেয়েটিকে মেঝেতে নামিয়ে দিল মামুন। তারপর পিছিয়ে এল এক পা। এগিয়ে এসে এক লোক টুইংকলকে কোলে তুলে নিল, বলল, 'তোমার ড্যাডি গাড়িতে অপেক্ষা করছেন।'

একলোক মামুনের দিকে মেশিন পিস্তল তাক করে আছে, আরেক লোক তাকে বলল, 'দেরি করছ কেন, ব্যাটাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দাও...'

তার কথা শেষ হলো না, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল টুইংকলের গলা চিরে, 'না! না! উনি আমাকে বাঁচিয়েছেন!'

সুট পরা লোকগুলোর পেশীতে ঢিল পড়ল। টুইংকলকে নিয়ে চলে গেল তারা, তবে যাবার আগে মেঝে থেকে মামুনের পিস্তলটা তুলে নিল।

পুলিস এল আরও পনেরো মিনিট পর। মামুন তাদেরকে জানাল, ঘটনা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার, প্রাণভয়ে শেলফের ওপর একা লুকিয়ে ছিল।

পরদিন কুরিয়ার সার্ভিস রানা এজেন্সির অফিসে ফুলের একটা স্তবক আর একটা বড় খাম দিয়ে গেল। ফুলের সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট ছিল, এলোমেলো কচি হাতে লেখা–'ফুলগুলো আমার তরফ থেকে, আর এনভেলাপটা ড্যাডির তরফ থেকে–আমার শ্রদ্ধা আর ড্যাডির কৃতজ্ঞতা জানবেন, টুইংকল।'

এনভেলাপের ভেতর থেকে মামুনের পিস্তলটা বেরুল, আর বেরুল এক হাজার ডলারের পঞ্চাশটা নোট। পিস্তলটা রেখে নোটগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে ফেরত পাঠাল মামুন, প্রেরকের ঠিকানায় ফেরত দেয়ার অনুরোধ সহ।

আজকের চিরকুটটা হাতে লেখা নয়, টাইপ করা। মেয়ের নাম করে সানডে নিজেই পাঠিয়েছে এটা। তবে তার উদ্দেশ্য যে অসৎ কিছু, তা বোধহয় নয়। মামুন সিদ্ধান্ত নিল কাল সকালে সিটি টাওয়ারে যাবে সে।

'আমার নাম কুনকুনো লাবু...তবে আপনি আমাকে সানডে বলতে পারেন।' পঙ্কেশ প্রৌঢ় সম্রাট হেসে উঠে ব্যাখ্যা করল, 'শ্বেতাঙ্গদের আমলে নিয়ম করে দেয়া হয়, আদিবাসী নামের সঙ্গে উচ্চারণ যোগ্য ইংলিশ ক্রিশ্চিয়ান নামও থাকতে হবে, তা না হলে বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে না। ষাট বছর আগে বিঙ্গা প্রদেশে জন্ম আমার। যে কেরানী আমার জন্ম তারিখ রেজিস্টার খাতায় তোলে তার কল্পনাশক্তি তেমন উর্বর ছিল না। রবিবারে জন্ম বলে আমার নামের সঙ্গে সানডে জুড়ে দেয় সে।'

'সানডে নামটা মনে রাখা সহজ, মন্তব্য করল মামুন। 'ছড়িয়েছেও আপনার এই নামটাই।'

সানডের সশস্ত্র লোকজন সিটি টাওয়ারের ছয়তলায় মামুনকে অভ্যর্থনা জানালেও, খানিক পরই তাকে নিয়ে উঠে আসে পনেরো তলায়। সিটি টাওয়ার রাজধানীর মাঝখানে অত্যাধুনিক একটা অফিস বিল্ডিং। সুট পরে থাকা সত্ত্বেও সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং-এর কারণে শীত শীত করছে ওর। তার মেজবান বিশাল এক মেহগনি ডেস্কের পিছনে বসে আছে, পরনে ডোরা কাটা কাপড়ের সুট, নীল শার্ট, ক্রীম কালারের টাই।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা জানালা দিয়ে হারারের স্কাইলাইন দেখছে সানডে। এক সময় ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে এনে মামুনের দিকে তাকাল। 'কোনকোন ঋণ কখনোই পরিশোধ করা যায় না,' বলল সে। 'শুধু দরজা খুলে অপেক্ষায় থাকতে হয়, যদি সে কোন সাহায্য চাইতে আসে। অনেক সময় সারাটা জীবন পার হয়ে যায়, সে আসে না। আপনি সেই প্রকৃতির মানুষ, মি. মামুন। তাই বাধ্য হয়ে ডেকেছি।'

'আপনার পরিচয় বা পেশা যা-ই হোক, প্রয়োজনের সময় সাহায্য চাইব না, এমন ভাবার কোন কারণ নেই,' বলল মামুন। 'আর সাহায্য যদি চাই, আপনার

সমস্ত কর্মকাণ্ডে আমার সায় বা সমর্থন আছে, তা ধরে নেয়াও ঠিক হবে না।'

'নিজের সম্পর্কে কিছু না বললেও চলবে, মি. মামুন, কারণ আপনাকে আমি চিনেছি,' বলল সানডে। 'কাজের কথায় আসি। একটা মাত্র কথা বলার জন্যে এখানে আপনাকে ডেকেছি আমি। সেটা হলো, আপনি বজ্রপাতে মারা যেতে পারেন।'

'কি? বজ্রপাতে মারা যাব!'

'হ্যাঁ। কেন, আপনি জানেন না?'

'কি জানি না?'

'গিনেস বুক অভ রেকর্ডস-এ লেখা আছে–সারা দুনিয়ায় জিম্বাবুইয়েতেই মাথা পিছু সবচেয়ে বেশি লোক বজ্রপাতে মারা যায়। গত বছর সম্ভবত পাঁচশোরও বেশি লোক মারা পড়েছে।'

'আপনি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস, মি. মামুন। তবে ঘটনাগুলো বেশিরভাগই গ্রাম্য এলাকায় ঘটে, আদিবাসীরা যেখানে মাটি আর কাঠের ঘরে বসবাস করে। আসলে, ওরা তো আর লাইটনিং কনডাক্টর সম্পর্কে জানে না।'

মামুন মৃদু হেসে বলল, 'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, লাইটনিং কনডাক্টর সম্পর্কে সবই আমার জানা আছে।'

'তাহলে পরিষ্কার করেই বলি–ওরা আপনাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করছে, মি. মামুন।'

'ওরা কারা?'

'একটু ভূমিকা করতে হয়, মি. মামুন,' জানালা দিয়ে আরেকবার হারারের স্কাইলাইনের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল সানডে। 'আপনি তো জানেনই, আইন ভেঙে টাকা রোজগার করা আমার পেশা। আমার ব্যবসাও অনেক, প্রতিটির জন্যে আলাদা বৈধ ফ্রন্ট আছে। তো এই রকম একটা ফ্রন্ট থেকে এক লোক আমার ছয়জন মার্সেনারি ভাড়া করেছিল হপ্তা কয়েক আগে।'

'ও, আচ্ছা।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মামুন। 'শহরে ওদের লাশ পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ। সন্দেহ করা হচ্ছে, লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল, সেজন্যেই আমার ম্যানেজাররা তাকে চিনতে পারেনি। ক'দিন আগে হঠাৎ খবর পেলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটা সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিঙ্গার একজন ব্যবসায়ী, তারও একদল মার্সেনারি দরকার। লোকটা ব্যবসায়ী হলেও, সে আর তার ছেলে কসাইদের মত অবলীলায় মানুষ মারে। আমি লোক লাগালাম, জানতে চেষ্টা করলাম কেন তার মার্সেনারি দরকার। গেলাম কেঁচো খুঁড়তে, বেরিয়ে পড়ল সাপ।'

'কি রকম?'

'আমার লোকজন খবর নিয়ে এল, মার্সেনারি ভাড়া করা হয়েছে রানা এজেন্সির ওপর হামলা করার জন্যে। ওদের হিট লিস্টে আছেন মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স, আপনি, লোটন নড্‌বেল নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আর আপনার বস্ মি.

মাসুদ রানা।' মামুন কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সানডে। 'আমি জানি আপনার বস্ আর নড্‌বেল জঙ্গলে ঢুকেছেন, কাজেই ওদের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শেরাটন হোটেলে মিসেস ভ্যান্স মার্সেনারিদের জন্যে একেবারেই সহজ টার্গেট।'

'আপনার তথ্য...'

'একশো ভাগ নির্ভুল,' বলল সানডে। 'দু'জন মার্সেনারি আজ দুপুরের ফ্লাইটে বুলাওয়েওতে যাচ্ছে, মি. মামুন। ওখান থেকে ভিক্টোরিয়া ফলসে যেতে একটা গাড়ির মাত্র চার ঘণ্টা লাগে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, মিসেস ভ্যান্সের ওপর আজ রাতেই কোন এক সময় হামলা হবে।'

'হামলা যদি হয়ও...'

এবারও মামুনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সানডে বলল, 'আমি এ-ও জানি যে পুলিস আর রানা এজেন্সির লোকজন মিসেস ভ্যান্সের নিরাপত্তার দিকটা দেখছে। তবু, আপনি যদি ওদেরকে ফোন করে জানান যে হামলা হবেই, ওরা আরেকটু বেশি সাবধান হবার সুযোগ পায় না?'

মামুনকে চিন্তিত দেখাল। 'ধন্যবাদ, মি. সানডে। কিন্তু আপনি আমাকে আংশিক তথ্য দিচ্ছেন। বিঙ্গার এই ব্যবসায়ীর পেশা আর পরিচয় দিন।'

'তার নাম ড্যান ক্লিফোর্ড হেগেল। সে-ও আমার মত বিঙ্গার লোক, তবে শ্বেতাঙ্গ। কয়েক পুরুষ আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে জ্যাম্বেজি উপত্যকায় ভূ-সম্পত্তি দখল করে ওরা, এলাকার কালোদের ক্রীতদাস বানায়, যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে বিশেষ বাহিনী গঠন করে, যুদ্ধের পর মন্ত্রী-পুলিস-বিচারককে লাখ লাখ ডলার ঘুষ দিয়ে যুদ্ধাপরাধীর তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাতিল করায়, পেশা হিসেবে গ্রহণ করে হাতি ও গণ্ডার শিকার...'

'ওরাই আপনার ফ্রন্ট থেকে মার্সেনারি ভাড়া করেছিল, মি. সানডে?'

'আমার তাই সন্দেহ,' বলল সানডে। 'ক্লিফোর্ডের ছেলে বিলফোর্ডই সম্ভবত ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল, চীনাদের প্রাইভেট জেটটা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বিঙ্গায় ফিরে গেছে, তার আগে খুন করেছে আমার ছ'জন লোককে। বিলফোর্ড নিজেকে জঙ্গলের রাজা বলে মনে করে–বর্তমান যুগের টারজান। আমি খবর পেয়েছি, গতকাল সকালে বিঙ্গার বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকেছে সে।'

মামুন চিন্তা করছে। নিজেকে প্রশ্ন করল, এ পরিস্থিতিতে পড়লে মাসুদ ভাই কি করতেন। মাথায় কয়েকটা আইডিয়া এল, প্রতিটি বিবেচনা করে দেখছে। জন বুকানির কাছে যেতে পারে সে, সূত্র গোপন রেখে তথ্যগুলো তাঁকে জানাতে পারে। জন বুকানির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, অনুরোধ ফেলতে পারবেন না–জেরা করার জন্যে হেগেলদের থানায় ধরে আনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জেরা করে লাভ কি, অভিযোগ প্রমাণ করার জন্যে মামুনের হাতে কোন প্রমাণ নেই। এ-সব না করে সে নিজেই সরাসরি ভিক্টোরিয়া ফলসে চলে যেতে পারে, তারপর মাসুদ ভাই আর লোটন নড্‌বেল জঙ্গল থেকে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

মিসেস ভ্যান্স এই মুহূর্তেও যথেষ্ট নিরাপদে আছেন, হামলা হলে রানা

এজেন্সির এজেন্টরা প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে তাঁকে। হারারে থেকে ফোনে ওদেরকে আরও সতর্ক থাকতে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এদিকটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে। দুঃসংবাদ হলো গতকাল জঙ্গলে ঢুকেছে বিলফোর্ড হেগেল–ধরে নিতে হয় মাসুদ ভাই আর লোটন নড্‌বেলের খোঁজেই। চেয়ার ছাড়ল মামুন। জিজ্ঞেস করল, 'বিলফোর্ড হেগেল সম্পর্কে আর কি জানেন আপনি, মি. সানডে?'

'সংক্ষেপে, এত বড় পাপী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি জন্মেছে কিনা সন্দেহ,' জবাব দিল সানডে। 'আমরাও রক্তপাত ঘটাই, প্রতিশোধ নিই, জোর-জুলুম করি–তবে একটা নীতি মেনে চলার চেষ্টা করি, সেই নীতিতে সামান্য হলেও বিবেক-বিবেচনা, দয়ামায়ার স্থান থাকে। কিন্তু এই বিলফোর্ড হেগেলের কোন নীতি নেই। তাকে আপনি একটা যান্ত্রিক কিলিং মেশিন বলতে পারেন।'

'একথা কেন বলছেন?'

একটু দম নিয়ে শুরু করল সানডে। 'যখন যাকে ধরে তার বংশ ধ্বংস করে ছাড়ে বিলফোর্ড। প্রথমে ধরেছিল হাতি, দু'বছরের মধ্যে তার এলাকায় একটা হাতিও বাঁচার সুযোগ পেল না। তার হাতি মারার কৌশল কি ছিল জানেন? হাতিরা পানি খেতে আসত, সেই পানিতে বিষ মিশিয়ে রাখত সে। কোন বুলেট খরচ না করে পালকে পাল মেরে ফেলত। তাতে শুধু যে দাঁতঅলা হাতি মারা গেছে তা নয়, বাচ্চা হাতিগুলোও বাঁচেনি। তারপর ধরল গণ্ডার। গণ্ডারও সব শেষ। চিতা আর লেপার্ডগুলোও তার ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তারপর, গত কয়েক বছর ধরে, শুনছি সে নাকি মানুষ শিকারে মেতেছে। বিশেষ করে কালো মানুষ শিকার করার ছুতো খুঁজে বেড়ায়...'

'জঙ্গলে সে কি রকম?'

'শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সেরা, কালোদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

'লোটন নড্‌বেল বা মাসুদ ভাইয়ের চেয়েও ভাল?' মামুনের চোখে সন্দেহ।

'বিলফোর্ড দক্ষ একজন অ্যামেচার, কিন্তু লোটন নড্‌বেল পুরোপুরি প্রফেশনাল। আর আপনার বস্ মাসুদ রানা সম্পর্কে আমি কোন সার্টিফিকেট দেব না, কারণ সে যোগ্যতা আমার নেই। আপনি ফুটবল খেলেন, মি. মামুন?'

'সময় পেলে, মাঝে মধ্যে।'

'আমিও তাই,' হেসে উঠে বলল সানডে। 'বিলফোর্ড আর নড্‌বেলের তুলনাটা এভাবে দিতে পারি–ধরুন, ভাল একজন ক্লাব প্লেয়ার আর পেলে।'

মামুন আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সম্রাট কুনকুনো আর ওরফে সানডে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

মামুন ধরে নিল, বিলফোর্ড জঙ্গলে ঢুকে থাকলে মাসুদ ভাই আর লোটন নড্‌বেলের চোখে ধরা পড়তে বাধ্য সে; তাকে ওঁরা আটকও করবেন। আটক করার পর জেরা করা হবে, তারপর পুলিসের হাতে তুলে না দিয়ে নিয়ে যাবেন তার বাপের কাছে। বাপকেও জেরা করবেন মাসুদ ভাই। একের পর এক অনেকগুলো নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, পুলিস কোন কিনারাই করতে পারেনি, কাজেই বাপ বা ব্যাটাকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার জন্যেই তো জঙ্গলে ঢুকেছেন মাসুদ ভাই।

আরও আধ মিনিট পেরিয়ে গেল। এতক্ষণে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল মামুন। বিঙ্গায় যাবে সে, হেগেলদের বাড়ির কাছাকাছি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবে–প্রয়োজন হলে মাসুদ ভাই আর লোটন নড়বেল তাকে যাতে ব্যাক-আপ হিসেবে পান।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে মামুন বলল, 'মি. সানডে, আপনি আমার এই উপকারটা করতে পারেন কিনা ভেবে দেখুন। কাল সকালের মধ্যে কারও চোখে ধরা না পড়ে বিঙ্গায় পৌঁছুতে চাই আমি, আপনি তার ব্যবস্থা করতে পারবেন? আমি নিজের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে চাইছি না।'

'আমার জন্যে এটা কোন সমস্যাই নয়,' খুশি মনে বলল সানডে। 'ওখানে আমার ব্যবসা আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার একটা ট্রাক হারারে থেকে রওনা হবে, চালাবে বিশ্বস্ত একজন ড্রাইভার–ওটার পিছনে লুকিয়ে থাকবেন আপনি।'

'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বারো ঘণ্টা। ভোরের আগেই বিঙ্গায়, হেগেলদের বাড়ির কাছাকাছি ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দেবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. সানডে। বৈধ কোন কাজে সাহায্য দরকার হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না। আর টুইংকেলকে এটা দেবেন।' পকেট থেকে মখমল দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স বের করল মামুন, ভেতরে সোনার চেইন আছে, লকেটে রয়েল বেঙ্গল টাইগার খোদাই করা।

'টুইংকল আপনাকে একবার দেখার জন্যে মাঝে মধ্যে খুব জেদ ধরে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়ষ্ট একটু হাসল সানডে। 'আমার যে পেশা, তাতে বোধহয় মেয়ের আবদার কোনদিনই পূরণ করতে পারব না, কি বলেন?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মামুন জবাব দিল, 'নিষ্পাপ একটা শিশুর সঙ্গে আপনার পেশার সম্পর্ক খুঁজতে রাজি নই আমি। কাজ সেরে হারারেতে ফিরে আসি, সময় করে একদিন দেখে আসব ওকে।'

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল সানডে, মামুনের হাতটা বারবার ঝাঁকিয়ে বলল, 'মেয়ের কাছে আমি ছোট হয়ে আছি। সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম, বুক ফুলিয়ে টুইংকেলের সামনে দাঁড়াতে পারব। ধন্যবাদ মি. মামুন, অশেষ ধন্যবাদ।'

পাঁচ

অনুভূতিটা ফাঁদে পড়ার, মেজাজ খুব তিরিক্ষি হয়ে আছে। নাগালের মধ্যে যাদেরকে পাচ্ছেন তারা যথেষ্ট প্রভাবশালী নয় বলে কারও ওপর ঝালও ঝাড়তে পারছেন না মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স, তাই রাগে শুধু ফুলছেন। পুলিস ইন্সপেক্টর জন টিকোলো বা রানা এজেন্সির এজেন্ট নাজমুল ও শাহেদ, এরা তো নেহাতই অধম, এদেরকে বকাঝকা করা মানে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা, নিজেরই সম্মান খোয়ানো। নার্স সিলভিয়াকেও তিনি অবোধ প্রাণীর ওপরে স্থান দিতে পারেন না। ছোটখাট ব্যাপার হলে এদের জীবন বিষিয়ে তুলতে ইতস্তত করতেন না, সবাইকে

রীতিমত কাঁদিয়ে ছাড়তেন। কিন্তু ব্যাপারটা ছোটখাট নয়। কোন কারণ না জানিয়ে তাঁর স্বাধীন চলাফেরায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, নির্দেশটা এসেছে রানা এজেন্সির হারারে চীফ মামুন কিংবা তার বস্ মাসুদ রানার তরফ থেকে, কাজেই গরল উদ্গিরণের জন্যে ওদের একজনকে তাঁর দরকার। কিন্তু কেউই তাঁর সামনে আসছে না। নিশ্চয়ই ভয়ে!

সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই, সিলভিয়ার সাহায্যে বাইরে বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি—জাম্বেজি নদীর পাশে সুন্দর একটা বাগান আছে, সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখবেন। তারপর ডিনার সারার জন্যে যাবেন নামকরা রেস্তোরাঁ ড্যাফোডিল-এ। কিন্তু রওনা হবার মিনিট পাঁচেক আগে নক হলো দরজায়, ইন্সপেক্টর টিকোলোকে নিয়ে হোটেলের স্যুইটে ঢুকল রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্ট। নাজমুলই মুখ খুলল, বলল, হারারে থেকে মামুন ফোন করে জানিয়েছে, তাঁর ওপর নাকি হামলা হবে। কাজেই সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত না করা পর্যন্ত সিলভিয়ার সঙ্গে স্যুইটেই থাকতে হবে তাঁকে, এমনকি এখানে বসেই ডিনার খেতে হবে। নাজমুল আরও জানাল, রি-ইনফোর্সমেন্ট হিসেবে রানা এজেন্সির আরও লোকজন পৌঁছে গেছে, পুলিসেরও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে, সবাই তারা হোটেলের ভেতরে ও বাইরে টহল দিচ্ছে। ভেতরে যারা আছে তারা পোর্টার আর ওয়েটারের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। যে দু'জন লোক ডিনার নিয়ে আসবে তারা রানা এজেন্সির লোক।

বিস্ময় আর বিরক্তি প্রকাশ করার সময় দেয়া হলো না তাঁকে, তিনজনই তারা স্যুইট থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

রাগ চড়ে গেল, পরিবেশিত ডিনার স্পর্শ করলেন না মিসেস ভ্যান্স, খানিকটা স্কচ খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙল মাঝরাতের খানিক পর।

ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন পাশের বিছানায় বসে রয়েছে সিলভিয়া, আতঙ্কে জড়োসড়ো অবস্থা। হোটেলের বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে, ভেতরে লোকজনের চিৎকার আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। অকস্মাৎ কামরার একটা জানালা বিস্ফোরিত হলো। ঝট করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন মিসেস ভ্যান্স, চিৎকার করে সিলভিয়াকেও তাই করতে বললেন। বিছানার ওপর আর মেঝেতে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল গোলাগুলি। তারপর বাইরের করিডরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ভয়ে নীল হয়ে গেছে মিসেস ভ্যান্সের চেহারা। দরজার বাইরে থেকে নাজমুলের গলা ভেসে আসতে খানিকটা স্বস্তিবোধ করলেন। নাজমুল গলা চড়িয়ে ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ করছে তাঁকে আর সিলভিয়াকে। বলল, 'আতঙ্কিত হবেন না, মিসেস ভ্যান্স। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে।'

দুই মিনিট পর বাইরে থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নাজমুল, সঙ্গে ইন্সপেক্টর টিকোলো।

নাজমুল বলল, 'আপনার জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছি আমি,

মিসেস ভ্যান্স। কারণ ওদের এক লোক জানালার নিচের কার্নিসে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার ছোঁড়া একটা বুলেট ঘরের ভেতর ঢোকে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আপনারা কেউ আহত হননি তো?'

'আততায়ীরা কি সত্যি আমাকে খুন করার জন্যে এসেছিল?' মিসেস ভ্যান্সের গলায় অবিশ্বাস, নাকি উত্তেজনা, বোঝা গেল না। তবে এই মুহূর্তে তাঁর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। তাঁকে নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছে, এ যেন তিনি বেশ উপভোগ করছেন। 'কারা তারা? তাদের পরিচয় কি?'

'জ্বী, ওরা আপনাকে খুন করার জন্যেই এসেছিল। পরিচয়...ভাড়াটে খুনী, মিসেস ভ্যান্স।'

'কেন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিসেস ভ্যান্স, 'আমাকে খুন করার জন্যে ভাড়াটে লোক পাঠানো হবে?'

'কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান আপনি, সেটাই আপনার অপরাধ,' জবাব দিল নাজমুল।

'তারা কি পালিয়েছে?'

'না,' কঠিন, প্রায় নির্মম হাসি দেখা গেল নাজমুলের ঠোঁটে। 'তিনজন এসেছিল। বাইরে তাদের লাশ পড়ে আছে। প্লীজ, মিসেস ভ্যান্স, বিছানা থেকে নামবেন না। চারদিকে কাঁচের টুকরো, পা ফেললেই কেটে যাবে। দু'মিনিট সময় দিন, দু'জন মেইডকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা সব কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের জন্যে অন্য একটা স্যুইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাকি রাতটুকু আর কোন ঝামেলা হবে না।'

'কিন্তু এর কি ব্যাখ্যা–এলাম খুনীদের ধরে শাস্তি দেয়ার জন্যে, অথচ তারাই লোক পাঠিয়ে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে, আর সেটা সামলাতে গলদঘর্ম হচ্ছেন আপনারা! তাহলে আমার প্রতিশোধ নেয়ার কি হবে?'

হেসে উঠে নাজমুল বলল, 'এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিসেস ভ্যান্স। রানা এজেন্সি প্রস্তুত হয়েই কাজে হাত দিয়েছে। খুনীরা কেউ রেহাই পাবে না।'

'কাজ কতটুকু এগোল, আপনারা আমাকে রিপোর্ট করছেন না কেন?'

এবার নিঃশব্দে হাসল নাজমুল। 'একেবারে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেয়া হবে আপনাকে, মিসেস ভ্যান্স। সেটা পাবার পর আপনার আর কোন আক্ষেপ থাকবে না–আমি কথা দিচ্ছি।'

লেকের কাছ থেকে জঙ্গলের ভেতর দিকে খুব দ্রুত এক কিলোমিটার এগোল ওরা। গত রাতে ওরা ফাঁদ পাতার জন্যে কোথাও থামেনি। সঙ্গে লবণ মাখানো শুকনো মাংসের ফালি আছে, তাই চিবিয়েছে। রানার পরামর্শ মেনে নিয়েছে নড়বেল–ঘুরপথে বিঙ্গা গ্রামের পিছন দিকে পৌঁছুবে ওরা, ডান দিকে ঘুরে গিয়ে রিজ-এর সামনে পড়বে। ওই রিজ-এর চারপাশেই প্রাসাদতুল্য দালান-কোঠা তৈরি করে শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলো বসবাস করে।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, তবে কেউই তেমন কথা বলছে না। দু'জনের আচরণেই অধৈর্য একটা ভাব। উঠতি সূর্য আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে, বনভূমি

এদিকটায় তেমন ঘন না হওয়ায় রোদে পুড়ছে ওরা।

শেষ বিকেলের দিকে রানার হাত ধরে টান দিল নড্‌বেল।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কি?' ফিসফিস করল।

নড্‌বেল বলল, 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঠোঁট টিপে একটু হাসল রানা, তারপর বলল, 'কখন বলবে তার অপেক্ষায় ছিলাম। দশ মিনিট আগেই টের পেয়েছি আমি।'

মুচকি হাসল নড্‌বেলও। 'তোমার অবজারভেশন বা অনুভূতির তারিফ করতে হয়। তবে আমি টের পেয়েছি এক ঘণ্টা আগে, আর সেজন্যেই ইচ্ছে করে খানিকটা ঘুরপথ ধরে একদল বেবুনকে বিরক্ত করি, ওরা যাতে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে। আরেকবার ভয় পায় ওগুলো, মিনিট পনেরো পর–চেঁচামেচির আওয়াজও শুনতে পাই।'

'হুম। তারপর?'

'তারপর, যে বা যারাই পিছু নিয়ে থাকুক, মুকুট পরা একঝাঁক তিতির পাখিকে বিরক্ত করে। এখন থেকে দশ মিনিট আগে বিরক্ত করে মুখরা এক হানি-গাইডকে–ওটার চিৎকারই শুনেছ তুমি।'

'আমাকে তুমি বলনি কেন?'

'প্রথমে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। পিছনে যে শব্দ আর গোলযোগ হচ্ছে, তার একটা প্যাটার্ন ধরতে পারলে অনেক সুবিধে। গোলযোগের ব্যবধানও, অর্থাৎ টাইমিংও খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এখন একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যে-ই পিছু নিয়ে থাকুক, আমাদের কাছ থেকে এক কিলোমিটার পিছনে থাকছে।'

'উদ্দেশ্য?'

'আমরা ক্যাম্প ফেলার অপেক্ষায় আছি। যখন বুঝবে ক্যাম্প ফেলেছি, কাছে আসার চেষ্টা করবে।'

'ওরা নয়তো? বাটোংকা ভাইরা? হয়তো আরও সোনা পেতে চায়।'

'মনে হয় না। ওরা জানে এই এলাকা আমার অত্যন্ত পরিচিত। সাবধানে ছিল, তারপরও আমি ওদেরকে ধরে ফেলি। আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি, তা-ও তারা জানে। তুমি হয়তো লক্ষ করেছ, সারাক্ষণ উঁচু জমিনে থাকছি আমরা, সামনে কোন অ্যামবুশ থাকলে সেটাকে এড়াবার জন্যে। বাটোংকারা পিছু নিলে এতটা অসাবধান হত না। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে তারা, মদ খেয়ে আমাদের অস্তিত্ব ভুলে যাবার চেষ্টা করছে।'

আবার হাঁটছে ওরা।

কিছুক্ষণ পর নড্‌বেল বলল, 'পিছন দিকে তাকিয়ো না। ওভার-কনফিডেন্ট প্রতিপক্ষ অকস্মাৎ কিছু করে বসতে পারে।'

'নির্বিঘ্নে আসতে না দিয়ে,' বলল রানা, 'একটু বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'কি করতে চাও তুমি?'

ছোট্ট করে বলল রানা, 'বাফেলো সার্কেল?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল নড্‌বেল। 'এদিকে বাফেলো সার্কেল কাজে আসবে না। বাফেলো সার্কেল সম্পর্কে শুনেছ তুমি, তবে কৌশলটা ব্যবহার করেছ বলে মনে হয় না।' রানা যাতে কিছু মনে না করে, মুখটা হাসি হাসি করে রাখল। 'তুমি আসলে মরু এলাকায় ওস্তাদ, কিন্তু এটা আমার নিজের এলাকা, এখানে আমি ওস্তাদ।'

নড্‌বেলকে আংশিক সমর্থন করল রানা। 'হয়তো,' বলল ও। 'ব্যাপারটা তুমি উপভোগও করছ। কিন্তু বাফেলো সার্কেল এখানে কাজে আসবে না বলছ কেন? কারণ দেখাও।'

'আহত একটা বাফেলো পথ ছেড়ে প্রথমে সরে যায় একপাশে, তারপর ঘুরে ফিরে আসে ফেলে আসা পিছনের পথে, অপেক্ষায় থাকে পিছু নেয়া ট্র্যাকারকে নাগালের মধ্যে পাবার জন্যে। কোথায় অপেক্ষায় থাকে?'

'পথের ধারে,' বলল রানা।

'শুধু পথের ধারে নয়, দোস্ত,' ভুলটা ধরিয়ে দিল নড্‌বেল। 'পথের ধারের ঘন ঝোপের ভেতর। ট্র্যাকার নাগালের মধ্যে এলেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে হামলা চালায়। এখানে সমস্যা হলো, আশপাশে কোথাও ঘন ঝোপ-ঝাড় নেই। ঘাস আছে, তা-ও লম্বা নয়; ঝোপ সামান্য, এখানে খানিকটা ওখানে খানিকটা; আর আছে মোপানি গাছ–একটা বাফেলো লুকিয়ে থাকার মত নয়।'

অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে হলো রানাকে। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা। তারপর রানা বলল, 'আমাদের দুই কিলোমিটার সামনে নিচু একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ভাবছি লোকটার চোখের আড়ালে পৌঁছে...'

'বা লোকগুলোর...'

'হ্যাঁ, লোক বা লোকগুলোর চোখের আড়ালে পৌঁছে বাম দিকে সরে যাব আমি, তার বা তাদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

নড্‌বেল জানতে চাইল, 'ধরো একজনই পিছু নিয়েছে। প্রশ্ন হলো, তাকে তুমি মারতে চাও, নাকি ধরতে?'

'অবশ্যই ধরতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে চোখের আড়ালে পৌঁছে স্রেফ বাঁ দিকে সরে গেলে কোন লাভ হবে না। লোকটা গোঁয়ার প্রকৃতির হলেও, ধরে নিতে হবে ট্র্যাকার হিসেবে সে খুব দক্ষ। মাটি এখানে এত আলগা, আমাদের পায়ের ছাপ পঞ্চাশ মিটার পিছন থেকে দেখতে পাবে সে। পায়ের ছাপ দু'দিকে চলে গেছে দেখে দ্রুত পিছিয়ে যাবে, তোমার ফাঁদ কোন কাজে আসবে না।'

'তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত?'

হঠাৎ চাপাস্বরে হেসে উঠল নড্‌বেল। 'তুমি শালা আমাকে ব্যঙ্গ করছ। শুধু মরুতে নয়, জঙ্গলেও তুমি ওস্তাদ। এত ছোট করছি, তা-ও গায়ে মাখছ না। বাফেলো সার্কেল যে কাজে লাগবে না এদিকে, তুমিও তা জানো। আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাই না? আবার জানতে চাইছে, এখন কি করা উচিত! নিজে যেন জানো না!'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'স্টিকস অ্যান্ড বুটস?'

'হ্যাঁ, স্টিকস অ্যান্ড বুটস।'

'এবার ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি–এই কৌশলটা সম্পর্কে আমি শুনেছি, কিন্তু কখনও ব্যবহার করিনি। একটু ব্যাখ্যা করো দেখি।'

'ঠিক আছে। তাকে বিশ্বাস করাতে হবে দু'জনকেই অনুসরণ করছে সে, একজনকে নয়।' হাত তুলে সামনেটা দেখাল নড্‌বেল।

'আড়ালে পৌঁছানোর পর, ওই নিচু পাহাড়ের পিছনে, থামব আমরা, একটা গাছ থেকে একজোড়া ছোট ডাল কাটব।

'শাখাগুলোর একটা প্রান্ত আমরা বাঁধব তোমার দুই বুটে। তোমার এক পায়ে জড়ানো থাকবে শর্টস, আরেক পায়ে শার্ট, তারপর পা টিপে টিপে বাঁ দিকে সরে যাবে তুমি, অন্তত আধ কিলোমিটার। তারপর ঘুরপথ ধরে আমাদের ট্র্যাক-এর পিছনে চলে যাবে, সেই সঙ্গে পৌঁছুবে তার বা তাদেরও পিছনে।

'নিচু ওই পাহাড়টার সামনে পরপর আরও তিনটে পাহাড় আছে, কাজেই আমিও দৃষ্টি পথের বাইরে থাকব। ক্যাম্প ফেলব তিন নম্বর পাহাড় ছাড়িয়ে। ওখানে যাবার সময়, তোমার বুট বাঁধা ডাল দুটো আমার হাতে থাকবে। আমার নিজের পায়ের ছাপের পাশে তোমার বুটের ছাপও পড়বে।

'তুমি থাকবে তার বা তাদের পিছনে। এক সময় তারা আমার ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসবে। ক্যাম্পটা এখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে হবে।' চোখ তুলে ডান দিকে তাকিয়ে ডুবন্ত সূর্যটা ঠিক কোথায় দেখে নিল নড্‌বেল। 'আমি গোধূলির শেষ লগ্নে ক্যাম্প ফেলব, আগুনের পাশে খাড়া করব তোমার একটা ডামি। তারা রাত নামার আগে ক্যাম্পে হানা দেবে না। ইতিমধ্যে তাদের একেবারে পিঠের কাছে পৌঁছে যাবে তুমি। সাধারণত যা করো, মাঝে মধ্যে নিজের পিছন দিকটা দেখে নিয়ো। নিচু পাহাড়টার আড়ালে পৌঁছানোর পর ঠিক আমি যা বলব তাই করবে তুমি, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা।

বিশ মিনিট পর নড্‌বেলের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল রানা। পাহাড়টার আড়ালে চলে আসার পর খানিকটা হেঁটে একটা মোপানি গাছের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না,' বলল নড্‌বেল। তরতর করে গাছটায় উঠল সে, গাছটার সামনে থেকে পিছন দিকে সরে গেল, প্রায় কোন শব্দ না করে ছুরি দিয়ে একজোড়া ডাল কাটল। নিচে নেমে এসে ডাল দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল। নামার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকল, ওঠার সময় যেখানে পা রেখেছিল ঠিক সেখানেই নামাল পা দুটো। 'এবার শার্ট আর শর্টস খুলে ফেলো। তবে সাবধান–যখনই একটা পা তুলবে, মনে রাখবে ওই একই জায়গায় নামাতে হবে বুটটা। শর্টস আর শার্ট বাঁ দিকে রাখো, পাশাপাশি, তারপর বুট থেকে পা বের করো–বুট যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, একচুল নড়বে না; তারপর এক পা রাখো শর্টসের ওপর, আরেক পা শার্টের ওপর। রাইফেল যেন মাটির স্পর্শ না পায়।'

ডালদুটো নড্‌বেলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। সবুজ সুতি শর্টস্‌টা খুলে বাঁ পাশে রেখে দিল। শার্ট খুলেও তাই করল, রেখে দিল শর্টসের পাশে। আন্ডারঅয়্যার ছাড়া পরনে আর কিছু থাকল না।

রানার প্রতিটি কাজ বা নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে নড্‌বেল।

বুটের ফিতে খুলল রানা। বুট থেকে পা বের করল। রানার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই নড্‌বেলও কোন শব্দ করছে না। পা বের করার সময় বুট জোড়া এক চুল নড়ল না দেখে মনে মনে ওর প্রশংসা করল সে। পা দুটো এক এক করে শর্টস আর শার্টের ওপর রাখল রানা।

এরপর কাজ শুরু করল নড্‌বেল।

ডাল দুটোর শেষ প্রান্তে ছোট এক গোছা করে শাখা-প্রশাখা আছে। একটা বুট তুলল সে, বুটের ভেতর শাখাগুলো ঢোকাল মূল ডালের একটা প্রান্ত সহ, তারপর নাইলন রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল, লক্ষ রাখল রশি যাতে বুটের তলায় না থাকে। দ্বিতীয় বুটেও একইভাবে ডাল আর শাখা ঢোকাল, তারপর দুটো বুটই যেখান থেকে তুলেছে ঠিক সেখানে নামিয়ে রাখল।

'কয়েক মিনিট ধরেই তোমার পা ফেলা লক্ষ করছি আমি,' রানাকে বলল সে। 'হাঁটার সময় এক পা থেকে আরেক পায়ের দূরত্ব আমার জানা হয়ে গেছে। তুমি প্রথমে পায়ের কিনারা ফেলো মাটিতে, কাউ বয়দের মত। এই ভঙ্গি বা ধরনটাই অনুকরণ করব আমি। তোমার পদক্ষেপ আর আমার অনুকরণ, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে এমন লোক মাত্র একজনকেই চিনি আমি।'

'কে জানে,' বলল রানা, 'সে-ই হয়তো আমাদের পিছনে আছে।'

মাথা নাড়ল নড্‌বেল। 'প্রশ্নই ওঠে না। সে ছিল ফ্রিডম ফাইটারদের একজন ট্র্যাকার। আমি তাকে অনেক বছর আগে খুন করেছি। এখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে।' শরীরের বাম পাশে টোকা দিল। 'আমার শরীরে সে তার ট্রেড মার্ক রেখে গেছে। পাঁজরের নিচে একটা ক্ষত।'

'ঠিক আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে। রওনা হয়ে যাও।'

মাটির ওপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে যাচ্ছে নড্‌বেল, মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থাকল রানা। শরীর থেকে হাত দুটো যথেষ্ট বাম দিকে লম্বা করে দিয়েছে সে, নির্দিষ্ট মাপা দূরত্বে মাটিতে ফেলছে রানার বুট জোড়া। রানা ঝুঁকল, শর্টস আর শার্ট জড়াল দুই পায়ে, নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে নিল ভাল করে। তারপর, যেন ভাঙা কাঁচের ওপর দিয়ে হাঁটছে, রওনা হলো বাঁ দিকে।

ছয়

বিলফোর্ড হেগেল অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, সমস্ত কৌশল তার জানা আছে। এই অনুসরণ উপভোগ করছে সে। হিংস্র কোন বন্য প্রাণী হলে এতটা মজা লাগত না, মানুষ শিকার করার আনন্দই আলাদা।

এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। আজ খুব সকালে ওদের অস্তিত্ব টের পায় সে, দু'জোড়া পায়ের ছাপ বিঙ্গার দিকে যাচ্ছে। জানে ওদের কাছ থেকে কতটা পিছনে রয়েছে সে, কাজেই কাঁধে ঝোলানো এনভয় এনফিল্ড রাইফেলটা হাতে নেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। পায়ের ছাপগুলো পিছন থেকে সরাসরি অনুসরণ করছে না, ওগুলোকে টপকে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে—কখনও ছাপের ডান দিকে চার কি পাঁচশো মিটার দূরে সরে আসছে, কখনও বাম দিকে। পিছু নেয়ার এই পদ্ধতি অত্যন্ত ক্লান্তিকর, তবে অ্যামবুশে পড়ার ঝুঁকি অনেক কমিয়ে আনে। প্রতিপক্ষের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন সে, আর এই সতর্কতা তার সারা শরীরে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে এই এলাকারই ওস্তাদ এক ট্র্যাকারকে অনুসরণ করছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ট্র্যাকার হিসেবে যার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিলফোর্ড ভয় কাকে বলে জানে না, তবে প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখতেও অভ্যস্ত নয়। রাইফেলটা কাঁধে থাকলেও, প্রয়োজনে চোখের পলকে হাতে চলে আসবে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় ক্ষুরের মত ধারাল হয়ে আছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে, তার অস্তিত্ব ওদের কাছে ধরা পড়েনি। দূরত্ব আরও খানিক কমিয়ে এনে দুটো গুলি করে ওদেরকে ফেলে দেয়া তার জন্যে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু ঘন জঙ্গল ছেড়ে খোলা ও উঁচু জমিনে সরে গেছে ওরা, এখন দূরত্ব কমিয়ে আনলে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে। এ-ধরনের ঝুঁকি এখুনি নেয়ার কোন মানে হয় না। একটু অপেক্ষা করলে সুযোগ নিজেই এসে ধরা দেবে।

সন্ধে হয়ে আসছে, এবার সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। ঝোপ-ঝাড় একটু বেশি আছে, এমন কোন জায়গায় ক্যাম্প ফেলবে ওরা আড়ালে আড়ালে থেকে এগোবে সে, পৌঁছে যাবে ওদের এক কি দুশো মিটারের মধ্যে।

প্রথমে দেশী ট্র্যাকার নড্‌বেলকে গুলি করবে বিলফোর্ড। ওস্তাদটাকে। গুলি করবে দু'বার, পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে। তার সঙ্গী দ্বিতীয় লোকটাকেও পালাতে দেয়া যাবে না। এই ব্যাটা বিদেশী নাকি তাকে ধরার জন্যেই এসেছে।

থেমে চারদিকে তাকাল নড্‌বেল, তারপর ক্যাম্পের জন্যে একটা জায়গা বাছাই করল। প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছে সে, নিজের পায়ের পাশে রানার বুটের ছাপ ফেলতে হয়েছে, ফলে হাত দুটো টনটন করছে ব্যথায়। ডাল আর বুটগুলো এক পাশে ছুঁড়ে দিল, তারপর কাজ শুরু করল দ্রুত। ঝোপ-ঝাড় কুড়িয়ে এনে নাইলন কর্ড দিয়ে এক করে বাঁধল, একটা মানুষের ঊর্ধ্বাঙ্গের আকৃতি পেল সেটা, ঘাড়ের ওপর রানার সঙ্গে মেলে এমন একটা মাথাও থাকল। তারপর আগুন জ্বালল, ঊর্ধ্বাঙ্গটাকে রাখল ওদের ট্র্যাক-এর উল্টোদিকে। দেখতে দেখতে আগুনটা বেশ গনগনে হয়ে উঠল, ডামির পাশে উবু হয়ে বসে থাকল নড্‌বেল, রাইফেলটা পাশে পড়ে আছে। পাউচ থেকে অলস ভঙ্গিতে এক ফালি শুকনো মাংস বের করে চিবাতে শুরু করল।

বিশ মিনিট পর খুব সাবধানে নিচু পাহাড়টাকে ঘুরে কোণ থেকে উঁকি দিল

বিলফোর্ড। এক কিলোমিটার দূরে আগুনটা। দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আপনমনে হাসল শিকারী। সন্ধে প্রায় হয়ে গেছে, তবে পাখিদের কলগুঞ্জন এখনও পুরোপুরি থামেনি। আগুন দেখলে হিংস্র পশুরা সাধারণত দূরে সরে যায়, সেদিক থেকে বিবেচনা করলে তার প্রতিপক্ষরা অন্তত একটা সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিরাপদ। তবে এই নিরাপত্তা ক্ষণস্থায়ী। কারণ বন্য যে-কোন হিংস্র প্রাণীর চেয়ে ভয়ঙ্কর সে। পিছু নিয়ে যখন এসেছে, তার হাত থেকে ওদের রক্ষা নেই। উত্তেজনায় তার শরীরের রক্ত নাচতে শুরু করেছে।

শিকারী লক্ষ করল, তার আর আগুনের মাঝখানে খানিকটা ঝোপ-ঝাড় চমৎকার একটা আড়াল তৈরি করেছে, প্রায় একশো মিটার দূরে। লুকাবার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে সে, তারপর অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হলে সামনে বাড়বে কাজ সারার জন্যে।

আগুন আর আগুনের পাশে বসে থাকা জোড়া মূর্তি আরেকবার ভাল করে দেখে নিল শিকারী। আগুনটাকে সামনে রেখে বসেছে ওরা। ডালে বসা নির্বোধ পাখির মত সহজ টার্গেট। ধীরে ধীরে, সাবধানে, নিজের ডান দিকে সরে যেতে শুরু করল সে, আগুনটার ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছুতে চায়।

বিশ মিনিট পর একটা পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পেল নড্‌বেল, তার সামনে ও খানিকটা বাঁ দিকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদিকে কেউ হাজির হয়েছে। আজ রাতের মত বিশ্রামের জন্যে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল পাখিটা, কেউ বিরক্ত না করলে অন্ধকারে ডানা মেলত না। হ্যাঁ, কোন হায়েনা বা বন্য কুকুরও বিরক্ত করে থাকতে পারে। তবে তার ইন্সটিঙ্কট বলছে, কোন মানুষের উপস্থিতি ভয় পাইয়ে দিয়েছে পাখিটাকে। নড্‌বেল এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়। রানাকে সে চেনে, তার ওপর শতকরা একশো ভাগ আস্থা রাখা যায়। গত এক ঘণ্টায় রানা যদি কোন কারণে অচল হয়ে পড়ত, তাকে সাবধান করার জন্যে অবশ্যই ফাঁকা একটা গুলি করত।

শিকারী পৌঁছে গেছে, জানে নড্‌বেল। এ-ও জানে যে শিকারীই এখন শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছে।

বিলফোর্ড হেগেল একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল। ঢোকার পর নড়ছে না সে, কান পেতে অপেক্ষা করছে। কোথাও কোন আওয়াজ নেই। সাবধানে ঝোপ ফাঁক করে সামনে এগোল সে। খানিক পরই আগুনটা আবার দেখতে পেল, সেটার ওদিকে বসে আছে দুটো ছায়ামূর্তি। সে জানে, আদিবাসী কালো লোকটার তুলনায় বিদেশী প্রতিপক্ষ আকারে বড়। অর্থাৎ বাঁ দিকে বসে থাকা বড় মূর্তিটাই বিদেশী। মাটির ওপর নিতম্ব রেখে বসল সে, কনুই রাখল ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর। এটাই তার প্রিয় পজিশন। ধারণা করল, যতটা শোনা গেছে, আসলে জঙ্গলে ততটা দক্ষ নয় নড্‌বেল। তার বসা উচিত ছিল আগুনের উল্টোদিকে, তাতে করে পরস্পরের পিছন দিকে নজর রাখা যেত। রাইফেলের স্টকটা গালের পাশে ঠেকাল সে, ধীরে সুস্থে লক্ষ্য স্থির করছে।

শান্ত কিন্তু কঠিন একটা গলা শুনল সে, ভেসে এল পিছন থেকে, 'ট্রিগার

থেকে আঙুল সরাও, বিলফোর্ড। মানে, যদি বাঁচতে চাও আর কি।'

রানা তাকে আগুনে ফেলল। আর্তনাদ করছে বিলফোর্ড, শরীরটা মোচড়াচ্ছে। গড়ান দিয়ে কোন রকমে আগুনটা থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু পোড়া সবুজ শার্টের ভেতর জ্বলন্ত একটা কাঠ ঢুকে গেছে। হাত দিয়ে সে ওটার নাগাল পাবে না, কারণ ওদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। শুধু হাত নয়, পা দুটোও এক করে নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে দিয়েছে রানা। আবার তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরুল গলা থেকে, গড়াগড়ি খাচ্ছে বিরতিহীন। এক সময় শার্টের ভেতর থেকে জ্বলন্ত কাঠ বেরিয়ে এল। বাতাসে মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফোঁপাচ্ছে সে, যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে শরীর, ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে।

একা বসে রয়েছে রানা, অলস ভঙ্গিতে শুকনো মাংসের ফালি চিবাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক আগে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে নড্‌বেল, নিশ্চিত হয়ে দেখে আসতে গেছে বিলফোর্ডের কোন ব্যাক-আপ আছে কিনা। ফিরতে আরও আধ ঘণ্টার মত লাগবে তার।

জেরিক্যান থেকে দু'ঢোক পানি খেলো রানা। হাত-পা বাঁধা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরপর আবার যখন তোমাকে কোন প্রশ্ন করব, সেটা আমি একবারই উচ্চারণ করব। দশ সেকেন্ড সময় পাবে। উত্তর দিলে ভাল, তা না হলে আবার আগুনে ফেলা হবে তোমাকে। যদি সঠিক উত্তর না দাও, বা আংশিক উত্তর দাও, ওই একই শাস্তি। এবার বলো, তোমার পুরো নাম কি?'

'জন বিলফোর্ড হেগেল!' আওয়াজ শুনে মনে হলো কেউ তার গলা চেপে ধরে আছে।

'তুমি আমাদেরকে খুন করতে এলে কেন?'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে উপুড় হলো বিলফোর্ড। তার চুল পুড়ে কুঁকড়ে গেছে। ভুরু বলতে কিছু নেই, শুধু কালো দাগ। বাম গালে ক্ষত, কমলা রঙের মাংস বেরিয়ে পড়েছে। রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে, দ্রুত ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনারা পোচার, গণার মারতে এসেছেন,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে। 'আইনে বলা আছে, পোচার দেখলে গুলি করা যাবে।'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল রানা, অলস ভঙ্গিতে দাঁড়াল, দু'পা এগিয়ে তার বুকের কাছে শার্ট আর শর্টস খামচে ধরে শূন্যে তুলল, তারপর ছুঁড়ে দিল আগুনের ওপর।

আধঘণ্টা পর আগুনের কাছে ফিরে এল নড্‌বেল। নিজের জায়গায় বসে মাংস চিবাচ্ছে রানা। ওদের প্রতিপক্ষ একটা মোপানি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, পাঁচ মিটার দূরে। চিবুকটা নেমে এসেছে বুকের ওপর, ফোঁপাচ্ছে এখনও। তার দিকে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিল রানা।

'কি, গান গাওয়ালে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নড্‌বেল।

'বলছে, সেই বিলফোর্ড হেগেল, ক্লিফোর্ড হেগেলের ছেলে। বিঙ্গায় ওর

বাপের একটা খামার আছে, কুমীর পালে। খামারটা বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়।'

রানার পাশে বসল নড্‌বেল। জেরিক্যান থেকে দু'ঢোক পানি খেলো। 'আর কিছু?'

আরেক দিকে হাত তুলল রানা, ওদিকেও একটা মোপানি গাছ দেখা যাচ্ছে, বিলফোর্ডের রাইফেল সেটার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। 'ওটা একটা পুরনো স্নাইপার রাইফেল। এনভয় এনফিল্ড। ৭.৬২ ক্যালিবার। এটা দিয়েই সাইফুর আর জেসিকাকে খুন করে সে।'

'স্বীকার করল?'

'হ্যাঁ, তবে একটু গরম করতে হয়েছে।'

'আর বাকি খুনগুলো?'

'ডক্টর খোদাবক্সের গাড়িতেও সে-ই বোমা ফিট করেছিল। ল্যাবটাতেও আগুন দেয়। চীনা ক্যান্স্যার রোগীদের প্লেনটাও উড়িয়ে দেয়।'

'কি বলছ! প্রতিটি অপরাধ স্বীকার করল?'

'বললাম না, গরম করতে হয়েছে।'

'জিজ্ঞেস করোনি, এতগুলো খুন কেন করল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, বলল, 'বলছে, ওর কোন দোষ নেই। ওর বাপ ওকে য়া করতে বলেছে ও তাই করেছে।'

'বাহ্! এই না হলে ছেলে! সব দোষ বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। তা, বাপজান কেন তাকে এতগুলো খুন করার নির্দেশ দিল?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বলছে, কারণটা ও জানে না। ও শুধু বাপের নির্দেশ পালন করেছে, কারণ জানতে চায়নি। আমার ধারণা, সত্যি কথাই বলছে ছোকরা।'

'এখন তাহলে বানচোতটাকে ধরতে হয়,' বলল নড্‌বেল। 'মানে বাপটাকে।'

'হ্যাঁ। পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল নড্‌বেল। 'এখুনি রওনা হলে বিঙ্গায় আমরা ভোর হবার আগেই পৌঁছে যাব।'

সিধে হলো রানা, হাতের মাংস আগুনে ফেলে দিল। 'চলো তাহলে।'

আট টনী লেল্যান্ড ট্রাকের ক্যাবে রয়েছে মামুন। সীটের সামনে মেঝেতে বসে ছিল, ড্রাইভার অভয় দেয়ায় মেঝে থেকে উঠে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল।

এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে ছোট্ট গ্রাম বিঙ্গা ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। গ্রামটা লেক কারিবার দক্ষিণ-পুব দিকে পটে আঁকা ছবির মত সাজানো। ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে, রাস্তা-ঘাট এখনও ফাঁকা, তবু সাবধানের মার নেই ভেবে ক্যাবের মেঝেতে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল সে।

ড্রাইভারের চেহারায় গম্ভীর ও আত্মবিশ্বাসী একটা ভাব আছে। লম্বায় সে এত কম, হুইলের ওপর দিয়ে সামনে তাকাবার জন্যে সীটের ওপর একজোড়া বড় কুশন রাখতে হয়েছে। তবে লোকটার দক্ষতা মুগ্ধ করেছে মামুনকে। এগারো ঘণ্টা গাড়ি চালাচ্ছে সে, থেমেছে শুধু প্রস্রাব পেলে আর পিছনে রাখা জেরিক্যান

এনে ট্যাংকে ফুয়েল ভরার সময়। কার্গো হিসেবে একজন ঠিকাদারের হেভি ফিশিং নেট বহন করছে ট্রাক, আরও আছে সেভদা চিলড্রেন পরিচালিত এতিমখানার জন্যে টিনে ভরা মাংস।

'আর তিন কিলোমিটার, বস্,' মামুনকে বলল ড্রাইভার। 'বাঁ দিকে তাকান, আলো দেখতে পাবেন–একটা রিজ-এর ওপর।'

'আলো?' জিজ্ঞেস করল মামুন। 'এই ভোরবেলা?'

'ও, আপনি তাহলে জানেন না! ক্লিফোর্ড হেগেলের সিকিউরিটি লাইট সব সময় জ্বালা থাকে। এই রাস্তায় বহু বছর ধরে আসা-যাওয়া করছি আমি, সাধারণত রাতেই। সব সময় বড় বড় আলো জ্বালিয়ে রাখে। এই নিয়ম সম্ভবত যুদ্ধের সময় থেকে চলে আসছে। এলাকাটা সে-সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। লেক পার হয়ে জাম্বিয়া থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আসত। যুদ্ধের পর আসত পোচাররা। তখনকার বিপদের সময় শ্বেতাঙ্গরা সব পালিয়ে যায়, মাত্র দু'পাঁচটা পরিবার সাহস করে থেকে যায়। নিজস্ব বাহিনী তৈরি করে তারা, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রচুর টাকা থাকলে যা হয়, দেশ স্বাধীন হবার পরও ওদের গায়ে আঁচড় লাগেনি।

'ব্যক্তিগত বাহিনী বেআইনী নয়?' জিজ্ঞেস করল মামুন। 'সরকারী নিষেধাজ্ঞা নেই?'

'বেআইনী তো বটেই,' বলল ড্রাইভার। 'কিন্তু বাহিনীর আকার ছোট করে আনা হয়েছে, নাম দেয়া হয়েছে বডিগার্ড, ফলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হচ্ছে না।'

'দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করেনি?'

'করেনি আবার! তিনবার। কিন্তু জিম্বাবুই বহু গোত্রে বিভক্ত একটা জাতি, বস্। দলাদলি আর আঞ্চলিকতা এই দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। সয়-সম্পত্তি আর ব্যবসা, সবই তো সাদাদের হাতে, ফলে কাজ বলুন কর্জ বলুন সবকিছুর জন্যে কালোরা ওদের মুখাপেক্ষী। যতই দেশ-বিরোধী ভূমিকা থাকুক, একদল কালো চিরকাল সাদাদের পক্ষ নিতে ভালবাসে। তাদের সাহায্যে প্রতিটি হামলা ঠেকিয়ে আজও টিকে আছে সাদারা।'

'বলছ বডিগার্ড। সংখ্যায় তারা কত হবে?'

'যত দূর শুনেছি, ক্লিফোর্ড হেগেলের বডিগার্ড পনেরো জন। সবাই তারা ম্যাটাবেল। হ্যান্ড-গ্রেনেড, মেশিন-গান, পিস্তল, সবই দেয়া হয়েছে তাদের। প্রত্যেকেই কুখ্যাত অপরাধী। এদের মধ্যে অনেকেই এক সময় পোচার ছিল। ভাল সুযোগ-সুবিধে পায়, প্রয়োজনে হেগেল পরিবারের জন্যে তারা প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না।'

'স্বাধীনতার পর সরকার এই শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি?' মামুন জানতে চাইল।

'না। সেজন্যে দায়ী আমাদের প্রেসিডেন্ট। মুগাবে ঘোষণা করেন, কোনরকম প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। অথচ নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেয়ায় অনেক ম্যাটাবেলকে পুলিস লেলিয়ে দিয়ে খুন করা হয়। ম্যাটাবেলরা বাধ্য হয়ে জঙ্গলে

পালিয়ে আসে। শ্বেতাঙ্গরা তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়।'

'তুমি কোন্ গোত্রের লোক, তাদের কি অবস্থা?'

'আমি শোনা গোত্রের লোক, বস্। আমাদের বসবাস উত্তরে। ম্যাটাবেলরা শক্তিধর, বাহুতে জোর আছে, সাহসীও বটে, কিন্তু আমরা শোনারা বুদ্ধিমান আর কৌশলী, ফলে দেশটা আমরাই চালাই।'

একজোড়া ট্যাবলেট মুখে পুরল মামুন—একটা অ্যান্টি-ডায়রিয়া, অন্যটা অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া। জেরিক্যান তুলে পানি খেলো সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ক্লিফোর্ড হেগেলের পনেরোজন বডিগার্ড শুধু পাহারা দেয়, অন্য কোন কাজ করে না?'

'এখন তো শ্বেতাঙ্গরা কোন বিপদের মধ্যে নেই, কাজেই তাদের বডিগার্ডেরও দরকার নেই,' বলল ড্রাইভার। 'শুধু ক্রিমিনাল টাইপের কিছু শ্বেতাঙ্গ বডিগার্ড রাখে। ক্লিফোর্ড হেগেলের ম্যাটাবেলগুলো ক্রোকোডাইল ফার্মে কাজ করে, নদীর কিনারায় হাঁটাহাঁটি করে ডিম খোঁজে।'

'বিপজ্জনক কাজ।'

বামুন ড্রাইভার মাথা ঝাঁকাল। 'ম্যাটাবেল জাতটাই বিপদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে, বস্।' ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছনে, ক্যাব শেলফের দিকে তাকাল একবার। মামুনের কালো রাকস্যাকটা রয়েছে ওখানে, পাশেই দেখা যাচ্ছে একে/ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল ও একটা কোল্ট ১৯১১। আবার রাস্তার ওপর চোখ রাখল সে। 'হারারেতে থাকতে আপনার গল্প খানিকটা কানে এল, বস্। কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি—বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি সাহস করছেন আপনি। আপনার কি কাজ আমি জানি না। জানতে চাইও না। শুধু বলব, এতটুকু অসতর্ক হবেন না। এদের বিরুদ্ধে লাগা আর গোক্ষুরের লেজে পা দেয়া, এক কথা।'

মামুন কিছু বলল না।

'শ্বেতাঙ্গরা বেশির ভাগই আমাদের রক্ত চুষছে, বস্,' বক বক করে চলেছে ড্রাইভার। 'তার মধ্যে ক্লিফোর্ড হেগেল হলো রাক্ষস, শুধু রক্ত চুষছে না, আমাদের হাড়-মজ্জা-মাংস সব খেয়ে ফেলছে। তার ছেলেটা আরও ভয়ঙ্কর। ম্যাটাবেলরা স্বীকার করে না, তবে নড়বেলদের মুখে শুনেছি সে নাকি মানুষ শিকার করে। কয়েকজন মন্ত্রীর ছেলে তার বন্ধু, বছরে একবার তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে জঙ্গলে নিয়ে আসে সে, তারপর মানুষ শিকারে বেরোয়। লোকমুখে শুনেছি, সত্যি-মিথ্যে যীশু বলতে পারবে।'

'ধন্যবাদ। আমি সাবধানে থাকব,' বলল মামুন। তারপর জানতে চাইল, 'তোমার কি ধারণা, এই সময়টায় ম্যাটাবেলরা বাড়িতেই পাহারা দিচ্ছে?'

মাথা নাড়ল ড্রাইভার। 'না। বছরের এই সময় ডিম খুঁজতে বেরোয় ওরা। ধরুন সাত থেকে আটজন নদী আর লেকের ধারে ঘোরাফেরা করছে।'

'বাড়ির কাছাকাছি?'

'না, বস্। অনেক দূরে। হেঁটে পৌঁছতে এই ধরুন দশটা সিগারেট।' মামুনের দিকে তাকিয়ে তামাটে রঙের দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। বামন

চেইন-স্মোকার। জিম্বাবুইয়ে প্রচুর তামাক চাষ হয়, ফলে সিগারেটের দাম খুব কম। রাতে যখনই মামুন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব জানতে চেয়েছে, সিগারেটের সংখ্যা উল্লেখ করে আনুমানিক হিসাব দিয়েছে সে। যদি বলে পাঁচ সিগারেট, বুঝতে হবে পাঁচটা সিগারেট খেতে যে সময় লাগে, আলোচ্য গন্তব্যে পৌঁছুতেও ওই সময় লাগবে। প্রতিবার তার এই হিসাব সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, ফলে মনে মনে কৌতুক বোধ না করে পারেনি মামুন। ড্রাইভারের দশ সিগারেট মানে হলো, হিসাব করে বের করেছে সে, কমপক্ষে আশি কিলোমিটার, এমনকি একশো কিলোমিটারও হতে পারে। অর্থাৎ, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন অ্যাকশন শুরু হয়, ক্লিফোর্ড হেগেলের সব বডিগার্ড তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে না।

'বললে ম্যাটাবেল বডিগার্ডদের কাছে হ্যান্ড-গ্রেনেড ও মেশিন-গান আছে। কিন্তু আমি জানি, জিম্বাবুইয়ে শুধু পিস্তলের লাইসেন্স দেয়া হয়।'

'শ্বেতাঙ্গদের সবার কাছে সব ধরনের অস্ত্র থাকে। ওদের লাইসেন্স দরকার হয় না, ঘুষ দিলেই চলে। তবে রাইফেলের জন্যে লাইসেন্স ইস্যু করার নিয়ম আছে। কারণ কুমীরের ডিম সংগ্রহ অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ।' হাত তুলে সামনে, খানিকটা বাম দিকে মামুনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল ড্রাইভার। 'ওই দেখুন আলো, বস্। বাড়িটাকে আমরা এক কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যাব।' হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা দেখাল। 'এটা যখন শেষ হবে।'

মামুনের জিনস্, শার্ট, বুট, খুলি কামড়ানো ক্যাপ, সবই কালো। পিছনের শেলফ থেকে একটা হেভী ফ্ল্যাক জ্যাকেট টেনে নিয়ে গায়ে চড়াল সে। তারপর শার্টের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলারের দুটো নোট বের করে ড্রাইভার আর নিজের সীটের মাঝখানে রাখল।

ড্রাইভারের আচরণ বিস্মিত করল তাকে, সামান্য লজ্জাও পেল। নোট দুটোর দিকে তাকাল লোকটা, হুইল থেকে হাত নামিয়ে তুলল সেগুলো, তারপর ফেলে দিল মামুনের কোলে। 'লাগবে না, বস্। অন্তত এই কাজে নয়। আমার বস্, মি. সানডে, এই ট্রিপে আমাকে ডাবল বোনাস দিয়েছেন।'

তার হাতের সিগারেট পুড়ে প্রায় আঙুল ছুঁই ছুঁই করছে। নিজের বাম দিকে তাকাল মামুন। উজ্জ্বল আলোগুলো দ্রুত কাছে চলে আসছে। শেলফ থেকে পিস্তলটা নিয়ে শোল্ডার-হোলস্টারে ভরল সে। সীটের কিনারায় সরে বসল, একে/ফরটিসেভেনটা পিঠে ঝোলাল, স্ট্র্যাপটা থাকল বুকের ওপর। পাউচে ভরল চারটে স্পেয়ার ম্যাগাজিন, বেল্টের বাম দিকে ঝুলে আছে ওটা।

'মূল বাড়ি থেকে ম্যাটাবেলদের কম্পাউন্ড কত দূরে?'

হাত তুলে দেখাল ড্রাইভার। 'কম্পাউন্ড একটা নয়, বস্, দুটো। একটা ম্যাটাবেলদের জন্যে, আরেকটা বাকি সবার জন্যে। আপনি দুটো কম্পাউন্ডেই আলো দেখতে পাচ্ছেন। ম্যাটাবেলদেরটা কাছে। বাড়ি থেকে ওটা আধ কিলোমিটার দূরে। বাকি আফ্রিকানদের কমপাউন্ড প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। কখনও যদি কোন গোলমাল বাধে অর্থাৎ গোলাগুলি হয়, অন্য আফ্রিকানরা নাক গলাবে না। অর্থাৎ তারা কোন ঝুঁকি নেবে না। মাথা নিচু করে বসে থাকবে যে

যার নিজের ঘরে। ক্লিফোর্ড হেগেল তাতে কিছু মনে করবে না, কারণ ওদেরকে এই কাজের জন্যে রাখা হয়নি।'

গিয়ার বদল করল ড্রাইভার, হালকাভাবে চাপ দিল ব্রেকে, তারপর উপচে পড়া অ্যাশট্রেতে হাতের সিগারেটটা জোর করে গুঁজে দিল।

'তুমি এত সব তথ্য জানলে কিভাবে?'

ড্রাইভার জবাব দিল, 'কয়েক বছর আগে পুলিসের ট্র্যাকার ছিলাম আমি, বস্। আমার হাইট কম তো, তাই বিধি মোতাবেক চাকরি হয়নি, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাই। পেতাম না, পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি দয়া করেছিলেন। চুক্তি শেষ হবার পর মি. সানডে আমাকে প্রস্তাব দিলেন, পুলিস বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা কিছু জানতে পারব তা যদি তাঁকে সব বলে দিই, তিনি আমাকে ড্রাইভারের চাকরি দিতে পারেন। আমি রাজি হয়ে যাই।' খিক খিক করে হাসতে শুরু করল সে।

'হাসছ কেন?'

'চাকরি হবার পর মি. সানডেকে একদিন বললাম, আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন, স্যার। উনি জানতে চাইলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার শর্ত আমি পূরণ করতে পারছি না, কারণ আমার পুলিস বন্ধুরা কিভাবে যেন জেনে ফেলেছে যে আমি আপনার চাকরি নিয়েছি, ফলে তারা আমাকে দেখামাত্র মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে, এমনকি তাকায়ও না। মি. সানডে বললেন, ঠিক আছে, কোন তথ্য আনতে হবে না, মন দিয়ে গাড়ি চালাও।

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।'

'ওই যে বললাম, পুলিসের ট্র্যাকার ছিলাম। তখনই পুলিস বন্ধুদের মুখ থেকে এ-সব জেনেছি। বস্, জায়গামত পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। বাম দিকে প্রকাণ্ড একটা গাছ আর ঝোপ আছে, একটু পরই দেখতে পাবেন। স্পীড একেবারে কমিয়ে আনছি, স্যার। গুড লাক, বস্।'

তার পিঠ চাপড়ে দিল মামুন। ট্রাকের গতি কমে এল। ক্যাবের দরজা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ল সে। পাঁচ সেকেন্ড পর একটা ঝোপের আড়ালে চলে এল। ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

সাত

বিলফোর্ড হেগেল জীবনে এত কষ্ট পায়নি। শরীরে আগুন লাগলে মরে যাওয়াই বোধহয় ভাল। তার ক্ষতগুলো তেমন গভীর না হলেও, প্রতিটি ফোস্কা ফেটে গেছে, তাছাড়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্ষতের সংখ্যা গুনেও শেষ করা যাবে না। শরীরের আগুন অনেক আগেই নিভে গেছে, অথচ তারপরও অসহ্য জ্বালা পাগল করে তুলছে তাকে, সুযোগ থাকলে সম্ভবত আত্মহত্যা করে বসত। তাকে যারা বন্দী করেছে, ওদের মনে দয়া-রহম বলে কিছু নেই। সে কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে,

গোঙাচ্ছে, পেশাব করে ফেলছে, অথচ এ-সব ওরা দেখেও না দেখার ভান করছে। হাত দুটো এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। পা জোড়াও বেঁধেছে, তবে এক করে নয়, দুই গোড়ালির মাঝখানে নাইলন কর্ড বিশ ইঞ্চি দীর্ঘ। কর্ডের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে তার, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়ে পড়তে হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হচ্ছে, অথচ মুখের সামনে মাত্র দু'বার পানির বোতল ধরা হয়েছে, তা-ও তিন সেকেন্ডের জন্যে।

প্রথম দু'ঘণ্টা ওদের দু'জনের প্রতি তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণা বোধ করেছে সে। তারপর বিস্ময়সূচক প্রশ্নটা ঢুকল মাথায়, ওদের ফাঁদে সে পা দিল কিভাবে? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হয়। নিজেকে সে জিম্বাবুইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাকার বলে মনে করে, কিন্তু পিছনের লোক দু'জন নেট দিয়ে প্রজাপতি ধরার মত সহজে তাকে বন্দী করেছে। আদিবাসী নড্‌বেল যখন 'স্টিক ওয়াকিং' শুরু করল, পার্থক্যটা তার চোখে ধরা পড়ল না কেন? মাসুদ রানা নামে বিদেশী লোকটা ট্র্যাক ছেড়ে সরে গেল, ঘুরপথে পৌঁছুল তার পিছনে, এটাই বা কেন তার চোখ এড়িয়ে গেল?

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে–তার পিছনে নিশ্চুপ দুই ছায়ামূর্তি কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মনে পড়ল, বিদেশী লোকটা ছোট্ট এক প্রস্থ কর্ড দিয়ে মুচড়ে পিঠে তুলে আনা দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল এক করে বেঁধে পুরোপুরি অচল করে ফেলে তাকে, তারপর প্রথম প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। রাগ আর ঘৃণা চেপে রাখতে পারেনি সে, উত্তরে একদলা থুথু ছিটায়। পরমুহূর্তে দেখতে পায়, আগুনের ওপর বসে আছে। কখন হাত বাড়াল, কখন ধরল, কখন ছুঁড়ে দিল, চোখ বা অনুভূতি দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এমন ঠাণ্ডা গলাও জীবনে কখনও শোনেনি বিলফোর্ড। প্রচণ্ড রেগে গেলে তার বাবার গলা অসম্ভব ঠাণ্ডা শোনায়, এই লোকের কণ্ঠস্বর তারচেয়েও শীতল, শব্দগুলো যেন বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল তার দিকে। চার ঘণ্টা পর মৃত্যুভয় ভর করল তার ওপর। প্রথমে সে ভেবেছিল, বাবা আর তাকে যদি কোর্টে তোলা হয়, বাবার প্রভাবশালী বন্ধুরা যেখানে যত সুতো আছে সব টেনে শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে আনতে পারবে। জেল-জরিমানা যা-ই হোক, দণ্ড স্থগিত রাখার ব্যবস্থাও তো করা যায়। কিংবা না হয় মাস কয়েক জেল খাটতেই হলো। কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে যতই সে এগোচ্ছে, ততই দৃঢ় হচ্ছে বিশ্বাসটা–ওরা ব্যাপারটা মেনে নেবে না। এমনকি হয়তো, আইন বা কোর্টের সাহায্যই হয়তো নেবে না ওরা। বিলফোর্ডের ভয় বাড়তে শুরু করল। এই প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আগে তার পরিচয় ঘটেনি। এরা অন্য ধাতুতে গড়া।

এখানে, পথের ওপর, আগুন জ্বলছে না। মৃত্যু ভয়ে কাতর মন মরিয়া হয়ে উঠতে চাইছে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল সে, তারপর বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'চোপ!' ধমকে উঠল রানা।

'আহা, শুনিই না কি বলতে চায়। বেজন্মা কুত্তা বলে তুমি ওকে গান গাইতেও দেবে না, এটা ঠিক না।'

নড্‌বেলের কৌতুকে রানা হাসল না। তবে চুপ করে থাকল।

প্রশ্রয় পেয়ে বিলফোর্ড বলল, 'আমি আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছি। তাতে করে বাবাও আমার সঙ্গে ফেঁসে গেছে।'

'বাহ্, কথাবার্তায় বুদ্ধির ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে, তাই না?' হেসে উঠল নড্‌বেল।

'আমি বলি কি,' ব্যথা সহ্য করার জন্যে দাঁত চেপে রেখেছে বিলফোর্ড, গলার আওয়াজ হিসহিসে শোনাল, 'আমার সঙ্গে একটা রফায় আসুন আপনারা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তাই না? আসুন, বরং চিন্তা করে দেখি ক্ষতিপূরণ করা যায় কিনা।'

'তোমার প্রস্তাবটা কি?'

'পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললে, বাবা হয়তো প্রচুর টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে রাজি হবে,' বলল বিলফোর্ড।

'ডক্টর খোদাবক্স, জেসিকা, সাইফুর, তিনজন চীনা ভদ্রলোক, পাইলট, কয়েকজন ক্রু, স্টুয়ার্ড, ছয়জন মার্সেনারি–সব মিলিয়ে কতজনকে মেরেছ তুমি? মাথা পিছু কত করে ক্ষতিপূরণ দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নড্‌বেল। 'ল্যাবে আগুন দিয়েছ, গাড়ি উড়িয়েছ, প্লেন ফেলে দিয়েছ...'

বিরক্ত হয়ে রানা বলল, 'এ-সব কি হচ্ছে, নড্‌বেল?'

বিলফোর্ড তাড়াতাড়ি বলল, 'বাবা হয়তো এক লাখ ডলার দিতেও আপত্তি করবে না।'

'অনেক কম হয়ে যায়,' মাথা নেড়ে বলল নড্‌বেল।

'দু'লাখ?'

'পঞ্চাশ লাখ থেকে শুরু করো, তারপর ওপর দিকে উঠতে থাকো,' বলল নড্‌বেল। 'তবু কথা দিতে পারছি না আমার বন্ধুকে রাজি করতে পারব কিনা।'

বিলফোর্ড বুঝতে পারল, তাকে নিয়ে খেলছে নড্‌বেল। সারা শরীরে তীব্র জ্বলুনি সত্ত্বেও শিরশিরে ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত নেমে এল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। মনে হলো ইস্পাতের চেয়েও কঠিন কোন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে ওরা। ওদের নিজস্ব তৈরি আইনে বিচার চাইবে, বিচারক আর জল্লাদের ভূমিকাতেও থাকবে নিজেরাই।

লেকের ডান দিক থেকে বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে ওরা। এই মুহূর্তে সেটা তিন কিলোমিটার দূরে। ম্যাটাবেলদের কমপাউন্ডটা ওদের বাম দিকে পড়বে। বিলফোর্ড একটা সিদ্ধান্ত নিল। কমপাউন্ড যখন আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে থাকবে, চিৎকার করে ম্যাটাবেলদের সতর্ক করে দেবে সে।

কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। আধ কিলোমিটার এগোবার পর রানার ঠাণ্ডা গলা থামতে বলল তাকে। এক মুহূর্ত পর শক্ত এক জোড়া হাত অনুভব করল কাঁধে, হাতড়াচ্ছে। চুল ধরে মাথাটা পিছন দিকে কাত করা হলো, মুখের ভেতর জোর করে ঢোকানো হলো এক টুকরো কাপড়, আরেক ফালি কাপড় দিয়ে মুখটা শক্ত করে বাঁধা হলো ঘাড়ের সঙ্গে।

বিলফোর্ডের কানে ফিসফিস করল নড্‌বেল, 'তোমার আর কোন গান আমরা শুনতে চাই না। এখন থেকে সাবধানে থাকবে, কোন রকম বেচাল দেখলে খুলির

পিছনে গুলি করব।'

শরীরটা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে এল, বিলফোর্ডের মনে হলো সে আর হাঁটতে পারবে না। পিছন থেকে তার নিতম্বে কষে একটা লাথি মারল নড্‌বেল, বলল, 'হাঁট শালা, সময় নষ্ট করছিস কেন!'

হোঁচট খেয়ে সিধে হলো বিলফোর্ড, ফুঁপিয়ে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করল। এখন আর কাউকে সতর্ক করার কথা মাথায় নেই। শুধু বাবার কথা ভাবতে পারছে। সবই এখন তার ওপর নির্ভর করে।

বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে থামল ওরা। বিলফোর্ডের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, তারপর কাত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল শরীরটা, চাপাস্বরে গোঙাচ্ছে সারাক্ষণ। সিকিউরিটি ফ্লাড লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে বাড়িটা। ওরা দু'জন কথা বলছে, শুনতে পাচ্ছে সে।

'ঘুরে পিছন দিকে গেলে ভাল হয় না?' নড্‌বেল জানতে চাইল। 'তারপর ইলেকট্রিসিটির লাইন কেটে দিলাম?'

মাথা নাড়ল রানা। 'লোডশেডিং-এ বাংলাদেশ যদি চ্যাম্পিয়ন হয়, জিম্বাবুই নিশ্চয়ই রানার্স আপ। হেগেলদের প্রাসাদে ইমার্জেন্সী জেনারেটর থাকতে বাধ্য। আয়োজনটাও সম্ভবত অটোমেটিক, বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনাআপনি জেনারেটর চালু হয়ে যাবে।'

চুপচাপ গুড়ি মেরে বসে থাকল দু'মিনিট, তারপর রাইফেল দিয়ে বিলফোর্ডের পাঁজরে গুঁতো মারল রানা। 'এই সোনার টুকরোটাই একমাত্র সন্তান, তাই না? এর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চলো দরজা পর্যন্ত হেঁটে যাই, তারপর কলিংবেল বাজাই।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল নড্‌বেল। 'আমি কোন সমস্যা দেখছি না।'

নড্‌বেলই টান দিয়ে দাঁড় করাল বিলফোর্ডকে। কোমর থেকে এক প্রস্থ নাইলন কর্ড নিয়ে একটা প্রান্ত নিজের রাইফেলের ট্রিগার গার্ডে জড়াল, অপরপ্রান্তটা জড়াল বিলফোর্ডের গলা আর ঘাড়ে। কর্ডের দুই প্রান্ত টেনে এক করে বাঁধার পর দেখা গেল রাইফেলের মাজল শক্তভাবে বিলফোর্ডের খুলির পিছনে সেঁটে আছে।

'ঝাঁকি খেলে বা দ্রুত ঘাড় ফেরালে মগজ বেরিয়ে আসবে,' বলল নড্‌বেল। 'মানে, যেটুকু আছে আর কি।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। ঝোপ-ঝাড়গুলোকে পাশ কাটাচ্ছে দেখেশুনে, সাবধানে।

আলোকিত একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ওদেরকে দেখতে পেল মামুন। অনেক দূরে, ওদের উল্টোদিকে রয়েছে সে, তা সত্ত্বেও দেখামাত্র প্রথমে রানার কাঠামো, তারপর নড্‌বেলের কাঠামো চিনতে পারল। কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারল সে।

প্রথমেই চিন্তা করল, পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে এখুনি ওদের সঙ্গে তার যোগ দেয়া উচিত। সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, কিন্তু তারপরই ট্রেনিঙের কথা মনে পড়ে গেল–সব সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে, হুট করে কিছু করবে না। যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকো, কি ঘটছে ভাল করে না বোঝা পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ডেই থাকবে।

একে/ফরটিসেভেনের সেফটি অফ করে আবার বসে পড়ল মামুন। উজ্জ্বল আলোয় তিনজনকে ধীরে ধীরে এগোতে দেখছে, বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে ওরা।

বাড়ির ভেতর, মাস্টার বেডরুমে, অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্লিফোর্ড হেগেলের। গভীর ঘুম থেকে জেগে পুরোমাত্রায় সচেতন হতে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময় লাগল তার। বিছানার হেডরেস্টে সেট করা অ্যালার্ম হাত-ঝাপটা দিয়ে অফ করল, বিছানা থেকে কার্পেটে নেমে পর্দা ফেলা জানালার দিকে এগোল। ঘাড়ে সিংহের মত সোনালি কেশর, শরীরটা যেন মেদহীন একটা দানবের, সোনালি লোমে ঢাকা, নড়াচড়ায় নিয়ন্ত্রিত ক্ষিপ্র একটা ভাব। ক্লিফোর্ড উদ্বিগ্ন নয়; সন্ধে থেকে ভোরের মধ্যে প্রায়ই এরকম অ্যালার্ম বেজে ওঠে। কৌতূহলী কোন হায়েনা বা অন্য কোন জানোয়ার বাড়িটাকে ঘিরে থাকা ইনফ্রারেড-রের সংস্পর্শে চলে আসে। কিন্তু পর্দাটা আধ ইঞ্চি সরিয়ে বাইরে তাকাতে বুঝতে পারল এবার সেরকম কিছু ঘটেনি। ছেলে বিলফোর্ডকে দেখে একটা হার্টবিট মিস করল সে। বিলফোর্ডের চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, সেজন্যে মনে কোন সহানুভূতি বা ব্যথা জাগল না, রাগে জ্বালা ধরে গেল শরীরে।

পঞ্চাশ মিটার দূরে রয়েছে ওরা। বিলফোর্ডের মাথার পিছনে রাইফেলের মাজল। লোক দু'জনও তার পিছনে। দৃশ্যটা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড দেখল সে, মনে মনে কাকে যেন অভিশাপ দিল, তারপরই দ্রুত কাজ শুরু করল।

দরজার পাশের একটা বোতামে পরপর চারবার চাপ দিল ক্লিফোর্ড। এই বোতাম ম্যাটাবেল কমপাউন্ডে সেট করা একটা ঘণ্টার সঙ্গে সংযুক্ত, চারবার বেজে ওঠার অর্থ চরম বিপদ দেখা দিয়েছে–টোটাল ইমার্জেন্সী। দরজা খুলে বেডরুম থেকে হলে বেরিয়ে এল সে, র‍্যাক থেকে একটা রাইফেল নামাল। পরনে শুধু ঢোলা সারং, পায়ে নরম চামড়ার চটি, হলের দরজার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

চার বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ডোরবেলটা আনিয়েছে ক্লিফোর্ড, আওয়াজটা তাকে তো বটেই, তার বন্ধু-বান্ধবকেও আনন্দ দান করে। দশ সেকেন্ড পর বাজল সেটা, বাইরে থেকে কেউ চাপ দিয়েছে বোতামে। কানে ঢুকল বিটোফেনের ফার্স্ট পিয়ানো কনসারটো।

রোলেক্স ডায়ালে চোখ, গুনে গুনে নব্বুই সেকেন্ড অপেক্ষা করল ক্লিফোর্ড। ভোর পাঁচটার সময় কারও ঘুম ভাঙতে এক দেড় মিনিট সময় তো লাগতেই পারে। হাতে অস্ত্র নিয়ে তৈরি হবার জন্যে এই সময়টা ম্যাটাবেলদের দরকার।

ইমার্জেন্সী বেল বাজার পর বসে নেই তারা, সম্ভবত এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে।

রোলেক্সের আলোকিত ডায়াল থেকে চোখ তুলে দরজার দিকে ঘুরবে, আবার ডোরবেল বেজে উঠল। উত্তেজিত হয়ে আছে ক্লিফোর্ড, কানে আওয়াজটা খুব তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল, তাগাদার সুরটা স্পষ্ট। রাইফেলের মাজল সিলিঙের দিকে তাক করা, চেইন সরিয়ে দরজার কবাট ফাঁক করল সে। পাঁচ মিটার সামনে বিলফোর্ড দাঁড়িয়ে, অগ্নিদগ্ধ মুখ নগ্ন আতঙ্কে বিকৃত, গলার আওয়াজ এত কর্কশ যে প্রায় অচেনা লাগল কানে।

'পা, হঠাৎ কিছু করে বোসো না···রাইফেলটা আমার ঘাড়ে বেঁধে রেখেছে!'

ছেলের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ক্লিফোর্ড। দুঃখ বা মায়ায় নয়, রাগে কেঁপে উঠল শরীরটা। 'কার এত সাহস যে আমার ছেলের গায়ে হাত দেয়!'

'পা, ওরা কি বলে শোনো···বোকার মত কিছু করে বসো না!' প্রাণভয়ে তোতলাচ্ছে বিলফোর্ড।

'তুমি কথা বোলো না!' ছেলেকে ধমক দিল ক্লিফোর্ড। 'একদম চুপ। নড়বে না।'

ছেলের পিছনে তাকাল ক্লিফোর্ড। এক লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে, খানিকটা বাম দিক ঘেঁষে, ডান হাতে রাইফেলটা ধরে আছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, ট্রিগারে তর্জনী। এই লোককে চেনে সে—স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের পরও, বীর হিসেবে খুব নাম করেছিল, লোটন নড়বেল। অপর লোকটা বিলফোর্ডের তিন মিটার পিছনে, খানিকটা ডান দিক ঘেঁষে। তার ডান হাতে একটা রাইফেল, ব্যারেলটা কাঁধের ওপর তোলা। বাম হাতে আরেকটা রাইফেল, মাজলটা মাটির দিকে তাক করা। দ্বিতীয় রাইফেলটা বিলফোর্ডের, চিনতে পারল সে। লোকটা মাসুদ রানা, মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স কন্যা-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাকে ভাড়া করে এনেছে।

মাসুদ রানাই কথা বলল, 'শোনো হে, রেড মাঙ্কি, তোমার হাতের ওই রাইফেল যদি এক ইঞ্চিও নড়ে, আমার বন্ধু তার রাইফেলের ট্রিগার টেনে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্তান হয়ে যাবে তুমি।'

'প্লীজ, পা! সত্যি ওরা তাই করবে!'

'শাটআপ, বিল!' গর্জে উঠল ক্লিফোর্ড। রাইফেলটা নাড়ল না। রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কি ঘটছে এখানে?'

'তোমার পুত্রধন জঙ্গলে আমাদের পিছু নেয়। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল, খুন করার জন্যে। ঠিক যেভাবে জেসিকা আর সাইফুরকে খুন করে।'

চট করে একবার ছেলেকে দেখে নিয়ে আবার রানার চোখে চোখ রাখল ক্লিফোর্ড। 'এ একেবারে ডাহা মিথ্যে! ওই ঘটনার সঙ্গে বিলের কোন সম্পর্ক নেই। আর, ও যদি জঙ্গলে তোমাদেরকে খুন করতে চাইত, এতক্ষণে তোমরা মরে ভূত হয়ে যেতে।'

রানার মুখে তিন-চারদিনের না কামানো দাড়ি। হাসল ও। তারপর ধীরে ধীরে বাম হাতের রাইফেলটা উঁচু করল। ক্লিফোর্ড লক্ষ করল, এক ফালি কাপড়ের সঙ্গে ঝুলছে রাইফেলটা।

'এটা তোমার ছেলের রাইফেল,' বলল রানা। 'ছোটবেলায় তুমি তাকে প্রেজেন্ট করেছিলে। পুলিসের ফরেনসিক এক্সপার্টরা মার্ডার বুলেট এই রাইফেল থেকে বেরিয়েছে কিনা বলতে পারবে। তোমার ছেলে বলছে, সবগুলো খুনই সে তোমার নির্দেশে করেছে। সেজন্যেই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

'এ-ধরনের কোন কথা আমার ছেলে বলতেই পারে না,' ক্লিফোর্ড হিসহিস করে উঠল। আবার বিলফোর্ডের দিকে তাকাল সে। এবার সময় নিয়ে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল। মুখ কয়েক জায়গায় পুড়ে গেছে, চামড়া না থাকায় কাচা মাংস বেরিয়ে পড়েছে। কনুই পর্যন্ত হাত দুটোতে চামড়া প্রায় নেই বললেই চলে। শার্ট আর শর্টসও অনেক জায়গা পোড়া। খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল, 'কোন্ সাহসে আমার ছেলেকে টরচার করা হয়েছে?'

'টরচার করলাম কোথায়, আগুনে ফেলে একটু ঝলসেছি,' বলল রানা। 'আসলে ভাগ্যটা ওর ভাল। সাধারণত কেউ আমাকে বা আমার বন্ধুকে খুন করতে এলে তার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করি না। ধরা পড়ার পর খুব তাড়াতাড়ি মারা যায় তারা। তবে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার আমার, তাই বলছি চলো ভেতরে গিয়ে বসি, পুলিস ডাকার আগে দু'চার মিনিট গল্প করি।'

ফ্লাডলাইটের আলো অসম্পূর্ণ একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, সেটার বাইরে চট করে একবার চোখ বুলাল ক্লিফোর্ড। কেউ নেই, কিছুই নড়ছে না। ম্যাটাবেলদের আরও সময় দিতে হবে। 'ঠিক আছে। পুলিসই ডাকব আমরা। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি বিলকে তোমরা ছেড়ে না দাও, তোমাদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিং, টরচার ও হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হবে। জিম্বাবুইয়ের জেলের চেয়ে নরকও নাকি আরামদায়ক। বিলের বাঁধন খুলে দাও।'

আবার হাসল রানা। 'তুমি চালাকি করছ, ক্লিফোর্ড। পুলিস না আসা পর্যন্ত তোমার ছেলেকে আমরা ছাড়ছি না।'

'তোমাদের উদ্দেশ্য কি? কি নিয়ে কথা বলবে?' কথায় ব্যস্ত রেখে ম্যাটাবেলদের সময় দিতে চাইছে ক্লিফোর্ড। চাইছে ঘরের ভেতর ঢোকার আগেই ম্যাটাবেলরা পৌঁছে যাক। কথা শেষ হতেই রানার পিছনে, ছায়ার ভেতর, কি যেন নড়ে উঠতে দেখল। তারপর ডান দিকেও। ম্যাটাবেল বডিগার্ডরা পৌঁছে গেছে, পজিশন নিচ্ছে চারদিকে।

উঁচু ঢাল থেকে মামুনও তাদেরকে পৌঁছুতে দেখল। আলোর বাইরে থামল তারা, তবে গায়ে আভা লাগায় পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। সব মিলিয়ে ছয় জন ম্যাটাবেল। তিনজনের হাতে রাইফেল, সম্ভবত একে/ফরটিসেভেন। বাকি তিনজনের হাতে হ্যান্ড-গান। নিঃশব্দে পজিশন বাছাই করছে তারা।

*

এবার ক্লিফোর্ডের হাসার পালা। কিছু একটা শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, আলোর অসমাপ্ত বৃত্তের বাইরে অস্পষ্ট কয়েকটা কালো আকৃতি দেখতে পেল।

'আজ এখানে কোন পুলিস আসছে না,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল ক্লিফোর্ড। 'ছকটা পাল্টে গেছে। তোমরা একটা ইনফ্রারেড অ্যালার্ম টপকে এসেছ।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' জবাব দিল রানা। 'তোমার একমাত্র সন্তান যমের বাড়ি থেকে এক মিলি-সেকেন্ড দূরে রয়েছে। ম্যাটাবেলরা আমাকে বা আমার বন্ধুকে গুলি করলেও ট্রিগার টানার সময় পাব আমরা।'

পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে ক্লিফোর্ড, তবে এখনও সে সময় পেতে চাইছে। আলোর বাইরে ইতিমধ্যে ছয়জন ম্যাটাবেলকে দেখেছে, আশা করছে কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকজন পৌঁছে যাবে। যত সময় পাবে, পরিস্থিতি ততই তার অনুকূলে চলে আসবে। 'বেশ, তাহলে এসো আলোচনা করি,' রানাকে বলল সে। 'তুমি একজন ইনভেস্টিগেটর, প্রাইভেট আই। কাজ করে টাকা কামাও। এসো, আমরা একটা চুক্তিতে আসি। তুমি ফিরে যাও, মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্সকে বলো যে যথেষ্ট ক্লু না থাকায় কেসটার কোন মীমাংসা করতে পারোনি। তার কাছ থেকে তোমার পাওনা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আমিও তোমাকে ভাল টাকা দিচ্ছি। কত পেলে খুশি হও, বলো। পঞ্চাশ হাজার ডলার? নগদে, নাকি সোনায়?'

আলোচনায় যোগ দিল নড্‌বেল। 'আগে তোমার ছেলেকে ধরে পেটাও,' বলল সে। 'কারণ, তোমার এত কষ্টের টাকা সব সে পানিতে ফেলে দিতে চায়।'

'মানে?'

'বিল এরইমধ্যে আমাদেরকে দু'লাখ ডলার সেধেছে, ক্লিফোর্ড,' বলল নড্‌বেল।

ক্লিফোর্ডের ভুরু কোঁচকাল, তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রানা বলল, 'ওহে, রেড মাঙ্কি, তোমার রিসার্চে ভুল আছে। আমরা টাকার বিনিময়ে কাজ করি না।'

ক্লিফোর্ড হাসল। 'এটা তোমার একদম বাজে কথা। আসলে দাম বাড়াচ্ছ। ঠিক আছে, দু'লাখ ডলারই দেব...'

ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে মামুন। ছয়জন ম্যাটাবেল একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে পজিশন নিয়েছে, সেটার একশো মিটারের মধ্যে চলে এসেছে সে। ক্লিফোর্ড আর রানার কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে তার কানে আসছে। হঠাৎ চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠল, ভাল করে তাকাতে আরও একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে, বাম দিক থেকে এগিয়ে আসছে। আলোর বলয়ে থাকা রানা বা নড্‌বেল তাকে দেখতে পাবে না। মূর্তিটা স্থির হয়ে গেল। হাঁটু গাড়ল মাটিতে, তারপর রাইফেল তুলল

চোখের সামনে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল মামুন। চিৎকার করে বলল, 'মাসুদ ভাই! নিচু হন!' পরমুহূর্তে তার হাতে গর্জে উঠল একে/ফরটিসেভেন, স্নাইপারকে গুলি করছে।

শুরু হবার পর মনে হলো বন্দুকযুদ্ধটা যেন অনন্তকাল ধরে চলছে, আসলে মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো। মামুনের গলা শুনে মেঝেতে বসে পড়ল রানা। ওর বসা সম্পূর্ণ হয়নি, নড্‌বেলের রাইফেল গর্জে উঠল। নাইলন কর্ডের লূপ ঝাঁকি খেলো, পিছিয়ে আনল এরইমধ্যে মৃত বিলফোর্ডকে। নড্‌বেল তার বুক এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে। ইতিমধ্যে রাইফেলটাও মুক্ত করে নিয়েছে। লাশটা এখনও ঝাঁকি খাচ্ছে, ওটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে সে।

একটা মাত্র গুলি করার সুযোগ পেল ক্লিফোর্ড, রানার বাম নিতম্বে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। দ্রুত পরপর তিনবার গর্জে উঠল রানার রাইফেল, বুলেটগুলো দরজা পার করে হলের ভেতর ছুঁড়ে দিল ক্লিফোর্ডকে। কয়েকটা গড়ান নিয়ে ডান দিকে সরে যাচ্ছে রানা, তারপর শরীরটা মুচড়ে আবার টান দিল ট্রিগারে।

বিলফোর্ডের লাশ সামনে নিয়ে গুটি মেরে বসে আছে নড্‌বেল, এক হাতে রাইফেল চালাচ্ছে। বিলফোর্ডের লাশকে পাশ কাটাল একটা গুলি, গুঙিয়ে উঠল সে, তার ডান উরুতে ঢুকেছে। সামনের অন্ধকার থেকে মামুনের একে/ফরটিসেভেন গর্জে ওঠার আওয়াজ পাচ্ছে রানা, আলোর আভায় ম্যাটাবেলদের শরীরগুলোকে পাক খেতে দেখছে।

তারপর সতর্ক, টান টান নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সবার আগে রানার গলা শোনা গেল, 'নড্‌বেল?'

নড্‌বেল বেসুরো গলায় জবাব দিল, 'পায়ে গুলি খেয়েছি।'

আলোর দিকে পিছন ফিরল রানা। 'মামুন?'

অন্ধকার থেকে জবাব এল, 'লেগেছে।'

এখনও ধুলোয় শুয়ে আছে রানা, হাতের রাইফেল একজন ম্যাটাবেলের দিকে তাক করা। লোকটা চিৎ হয়ে শুয়ে, কাঁধ খামচে ধরে গোঙাচ্ছে। 'নড়বে না, মামুন,' বলল ও, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নড্‌বেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি অচল?'

'না, দোস্ত।'

'বাড়িটা সার্চ করো,' নির্দেশ দিল রানা।

বিলোফোর্ডের লাশ মাটিতে ফেলে সিধে হলো নড্‌বেল, তারপর দরজার দিকে এগোল। তার পিছু নিল রানা।

হলের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্লিফোর্ড, পেটটা দু'হাতে চেপে ধরা, চেহারায় শুধু ব্যথা নয়, বিহ্বল একটা ভাবও ফুটে আছে। পা দিয়ে রাইফেলটা তার নাগালের বাইরে সরিয়ে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করল রানা। নগ্ন শরীরটায় এক লাইনে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত তিনটে গর্ত তৈরি করেছে বুলেটগুলো। নাড়িভুঁড়ি

সব বেরিয়ে আসতে চাইছে, ছড়ানো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে কোন রকমে আটকে রেখেছে ক্লিফোর্ড। দু'এক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে সে।

রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'জলদি! জলদি! প্লীজ! হাসপাতালে নিয়ে চলো আমাকে। ছয় মাইল দূরে, বিদায়···তাড়াতাড়ি!'

মাথা নাড়ল রানা। 'আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

দ্রুত এক কামরা থেকে আরেক কমরায় ঢুকছে নড্‌বেল, হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল। উরুতে গুলি লাগায় হাঁটাচলায় তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। চামড়ার নিচে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে সে। কুশন হিসেবে ভালই ছিল বিলফোর্ড। বাড়ির ভেতর কাউকে পেল না সে, তবে বেডরূমে কমবিনেশন লক সহ প্রকাণ্ড একটা ওয়াল-সেফ দেখল। পা চালিয়ে হলে ফিরে এল আবার।

ক্লিফোর্ডের ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা।

'বাড়ি খালি,' বলল নড্‌বেল। 'বেডরূমে একটা ওয়াল-সেফ আছে। কমবিনেশন লক।'

'কমবিনেশন,' ক্লিফোর্ডকে বলল রানা। 'তারপর হাসাপাতালে পাঠাব।'

প্রায় চিৎকার করে সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করল ক্লিফোর্ড, শুনে আবার ঘুরল নড্‌বেল, হল ধরে ছুটল। বেডরূমে ঢুকে নম্বরগুলো ডায়াল করল, বড়সড় হাতলটা ধরে টান দিল নিচের দিকে। ভারী দরজাটা খুলে গেল। ভেতরের শেলফে কয়েকটা মাত্র ফাইল, বাকি জায়গা দখল করে রেখেছে বান্ডিল করা একশো ডলারের নোট। গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, নড্‌বেল আন্দাজ করল বান্ডিলের সংখ্যা এক হাজারের কম হবে না। প্রতিটি বান্ডিলে সম্ভবত একশোটা করে নোট আছে। একটা দেরাজে একজোড়া পিস্তলও দেখল সে।

আবার ছুটে হলে ফিরে এল নড্‌বেল। এবার তার উরু ব্যথা করতে শুরু করেছে। 'ভুল নম্বর দেয়নি। সেফ খুলে ফেলেছি।'

সিধে হলো রানা, এখনও তাকিয়ে আছে ক্লিফোর্ডের দিকে।

'ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠাবে?' জিজ্ঞেস করল নড্‌বেল।

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু শুধু পেট্রলের অপচয়।'

কিছু বলতে গিয়ে হাঁ করল ক্লিফোর্ড, কিন্তু কথা নয়, শুধু বাতাস বেরুল। ঝাঁকি খেয়ে কাত হয়ে গেল শরীরটা, হাত দুটো খসে পড়ল পেট থেকে, মেরুন রঙের মোজাইক করা মেঝেতে হড়হড় করে বেরিয়ে এল সমস্ত নাড়িভুঁড়ি। আরেকটা ঝাঁকি খেয়ে মারা গেল সে।

'অপরাধ স্বীকার করেছে,' বলল রানা। 'সেফের ফাইলে কিছু নোট আর চিঠিপত্র আছে, প্রমাণ হিসেবে কোর্টে দাখিল করা যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি পুলিসকে ফোন করো, আমি মামুনকে দেখতে যাচ্ছি।'

ছোট একটা ঢিবি পার হয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটছে রানা। হঠাৎ মামুনের কাতর গলা শুনতে পেল। তারপর দেখল উপুড় হয়ে হয়ে শুয়ে আছে সে। পাশে হাঁটু গেড়ে জানতে চাইল, 'কোথায়, মামুন?'

ব্যথায় হাঁসফাঁস করছে মামুন, তবে গলায় জোর আছে, বলল, 'একটা কাঁধে

লাগে, ফলে শরীরটা ঘুরে যায়, তারপর পিছনে লাগে···নিচের দিকে।'

'ব্যথা করছে?'

'শুধু কাঁধে।'

'নড়বে না। একদম নড়বে না।' যতটা সম্ভব সাবধানে, মামুনের রক্তভেজা শার্টটা ওপরে তুলল রানা। শিরদাঁড়ার একেবারে নিচে ক্ষতটা কোন রকমে দেখা গেল আলোর অস্পষ্ট আভায়। ওর বুক ধক করে উঠল, মাথার ভেতর শব্দহীন ঝর্ণার মত লাফিয়ে উঠল এক ঝাঁক অভিশাপ। তবে কথা বলছে একদম শান্ত গলায়, 'নোড়ো না, মামুন। এক চুল নোড়ো না। এখুনি তোমাকে নিয়ে যাব আমরা।'

মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে আছে মামুন। শুধু বলল, 'মাসুদ ভাই, নিচের দিকে আমি কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

আট

হোটেল শেরাটনের বাগানে বসে জলপ্রপাত দেখছেন মিসেস ভ্যান্স। বিশাল জাম্বেজী নদী তাঁর বিশ মিটার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নদীর রোমাঞ্চকর পতন, কান ফাটানো আওয়াজ, নিচে থেকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠে আসা জলকণার মেঘ তাঁকে মুগ্ধ করলেও, মনটা ভাল না থাকায় এ-সব তিনি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছেন না। একাই বসে আছেন, তবে দেখতে না পেলেও জানেন রানা এজেন্সির এজেন্টরা আশপাশেই আছে, নজর রাখছে তাঁর ওপর।

মনটা পড়ে আছে দূরে, রহস্যময় ও বিপজ্জনক জঙ্গলে। তাঁর ধারণা, দু'একদিনের মধ্যে ফিরে এসে রানা আর নড়বেল রিপোর্ট করবে, কিছুই পাওয়া যায়নি। সেজন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আছেন তিনি। কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সাধ্যমত সব কিছুই তো করে দেখলেন। মাসুদ রানার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। ও যদি খুনীকে ধরতে না পারে, মনে করতে হবে এ-কাজ আর কারও দ্বারাও সম্ভব নয়। কাজেই এরপর আর কোন চেষ্টা না করাই ভাল। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শুনে সংবিৎ ফিরল তাঁর।

'মিসেস ভ্যান্স।'

ওয়েটার ভেবে ঘাড় ফেরালেন মিসেস ভ্যান্স। ওয়েটার নয়, নাজমুল। সঙ্গে পুলিস ইন্সপেক্টর টিকোলোও রয়েছে। 'হ্যাঁ, বলো। কি খবর?'

'মিসেস ভ্যান্স,' বলল নাজমুল, 'আমাদের ডিরেক্টর মি. মাসুদ এই মাত্র ফোন করেছিলেন। খবরটা আপনাকে জানাতে বলেছেন তিনি। আপনার মেয়ে ও মি. সাইফুরের খুনী জন বিলফোর্ড হেগেল আজ ভোরে গুলি খেয়ে মারা গেছে। তার সঙ্গে আরও চারজন।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না মিসেস ভ্যান্স, বোবা দৃষ্টিতে

নাজমুলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরাই যে দায়ী ছিল, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। আমাদের হাতে নিশ্ছিদ্র প্রমাণ আছে।'

'ওরা কি রানার হাতে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। তবে মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে লোটন নড্‌বেল আর মামুন হোসেন ছিলেন। লেকের কাছাকাছি একটা বন্দুকযুদ্ধ হয়।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম মামুন হারারেতে আছে।'

'হ্যাঁ। আমরাও তাই জানতাম। তবে খবর পেয়েছি কাল সে হারারে থেকে রওনা হয়।'

'খুনীরা কি কালো?'

'না। সাদা। বাপ আর ছেলে।' নাজমুল হাতঘড়ি দেখল। 'বিস্তারিত সব আমি আপনাকে প্লেনে ওঠার পর জানাব।'

মিসেস ভ্যান্স যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। বার কয়েক চোখ মিটমিট করে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লেনে উঠব?'

'হ্যাঁ। আপনার প্লেনে, মিসেস ভ্যান্স। আমরা বুলাওয়েওতে যাচ্ছি। এইমাত্র আপনার নার্সের সঙ্গে কথা বলে হোটেল থেকে বেরুলাম, তাকে আমি আপনার সুটকেস গুছাতে বলে এসেছি। ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন ক্রুদের তৈরি হতে বলেন।'

'কিন্তু বুলাওয়েওতে কেন যাচ্ছি আমরা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য দিকে তাকাল নাজমুল। প্রশ্নের জবাব দিল ইন্সপেক্টর টিকোলো, 'মিসেস ভ্যান্স, রানা এজেন্সির আফ্রিকান চীফ মি. মামুন বন্দুকযুদ্ধে আহত হয়েছেন। তাঁর আঘাত খুব গুরুতর।'

'ওহ্ গড! বেঁচে যাবে তো?'

টিকোলো বলল, 'বলতে পারছি না। খবরটা যখন আসে আমি তখন বিঙ্গায় ছিলাম। বিঙ্গার হসপিটালে তাকে আমরা ভর্তি করি, কিন্তু সেটা একেবারেই ছোট, আধুনিক সুযোগ-সুবিধের অভাব। দু'ঘণ্টা আগে বিঙ্গা থেকে রওনা হই আমি, তখন তার অবস্থা অপরিবর্তিত দেখে এসেছি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তাকে বুলাওয়েওতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানকার হসপিটালটা আধুনিক। তাঁর সঙ্গে মি. রানা আর মি. নড্‌বেল আছেন। আমাদের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানিও হারারে থেকে বুলাওয়েওতে আসছেন। পুলিস খুনীদের তিনজন সহযোগীকে বুলাওয়েওর জেল-হাজতে পাঠিয়েছে।'

হুইলচেয়ার ঘোরালেন মিসেস ভ্যান্স। 'চলো, চলো—এখানে আর সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না।'

সন্ধ্যার অনেক পর কেবিনে ঢুকল রানা। বিছানার পাশে বসে ছিল নার্স। সে একজন নানও বটে। মেয়েটা কালো। রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রানা বলল, 'আপনি কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করবেন, প্লীজ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল নার্স, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। বিছানার কিনারায় বসল রানা, মামুনের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'কেমন আছ, মামুন?'

মামুন জবাব দিল না। রানার মুখে চোখ তুলে বলল, 'আমাকে জানান, মাসুদ ভাই।'

'ভাল নয়।'

'জানান, প্লীজ!'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'তোমার কাঁধের ক্ষতটা কোন সমস্যা নয়। ওটা শুকিয়ে গেলে হাতটা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে। আগের মতই।'

'দ্বিতীয়টা?'

'খারাপ। বুলেট তোমার স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে ফেলেছে। কোমর থেকে নিচের অংশ প্যারালাইজ্‌ড হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। তারপর মামুন বলল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছি। এ-ও জানি যে এর কোন চিকিৎসা নেই। এখন নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এখানকার ডাক্তারকে দিয়ে লন্ডনের কয়েকজন স্পেশালিস্টকে ফোন করিয়েছি। তাঁরাও একই কথা বলেছেন। ড্যামেজটা মেরামত যোগ্য নয়। জিম্বাবুইয়ে আঠারো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছে, গুলি খাওয়া লোকজনের চিকিৎসা করে এখানকার ডাক্তাররা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিছু করার থাকলে করতেন, বা অন্য কোথাও পাঠাতে বলতেন।'

'বুঝতে পারছি।'

'তোমাকে শক্ত হতে হবে, মামুন। এখানে আমরা আরও হপ্তা দুয়েক থাকব। তারপর তোমাকে নিয়ে চলে যাব আমেরিকার লাস ভেগাসে। দেশে নয়, ওখানেই নতুন জীবন শুরু করবে তুমি। দেশেও যাবে, তবে মাঝে মধ্যে। তোমার আম্মাকে লাস ভেগাসে আনাবার সব ব্যবস্থা আমরাই করব।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'কাজটা তোমার জন্যে সহজ হবে না, জানি। তবে তুমি খুব শক্ত ছেলে, কাজেই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে দিতে পারবে।' মামুনের হাতটায় সামান্য চাপ দিল ও।

প্রায় রুদ্ধস্বরে মামুন বলল, 'মানিয়ে নেয়ার কথা আমি ভাবতে পারছি না, মাসুদ ভাই। এভাবে জীবন কাটাবার কথা কল্পনাও করতে পারি না। যতবার মিসেস ভ্যান্সকে দেখেছি, ততবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, একটা মানুষ এভাবে বেঁচে থাকে কি করে। উনি তো তবু দীর্ঘ বহু বছর সুস্থ জীবন কাটাবার পর পঙ্গু হন। কিন্তু আমার বয়েস এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, আরও চল্লিশ বা পঞ্চাশটা বছর একটা হুইলচেয়ারে বসে কিভাবে সময় কাটাব? আর মেজাজ? সেটার কি হবে? আমার সংস্পর্শে যারাই আসবে, তাদের জীবন নরক করে তুলব আমি। দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে। এ স্রেফ সম্ভব নয়, মাসুদ ভাই।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে বটে,' বলল রানা, 'কিন্তু সময় তোমাকে সাহায্য

করবে। মানুষের মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য, মামুন, প্রায় অসীম। তোমার মত অবস্থায় আরও অনেককে পড়তে দেখেছি আমি, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে তারা, কেউ কেউ শুধু মানিয়ে নেয়নি, রীতিমত সুস্থ-সুন্দর জীবন কাটাচ্ছে। তারাও তোমার মত প্রথমে ফেস করতে ভয় পেয়েছে, কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করেছে। কাজটা কঠিন, তবে তুমি পারবে। তোমাকে আমি চিনি।'

বালিশে মাথা নাড়ছে মামুন। 'মাসুদ ভাই, ওই জীবনে আমার দরকার নেই। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা বদলাতে পারব না। আপনি জানেন, আপনাকে আমি কি করতে বলব?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'মামুন, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দাও। তুমি আমার রক্ত-সম্পর্কের কেউ নও, তবু আমার আপন ভাই থাকলে তাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসতাম বলে মনে হয় না। এর কোন বিকল্প নেই, ভাই–তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কে জানে? পাঁচ কি দশ কি পনেরো বছর পর হয়তো নতুন কোন সার্জিকাল টেকনিক আবিষ্কার করবে ওরা, ছেঁড়া স্পাইনাল কর্ড হয়তো তখন জোড়া লাগানো কোন সমস্যাই হবে না।'

আবার মাথা নাড়ল মামুন। 'এ আপনি নিজেও বিশ্বাস করেন না, মাসুদ ভাই। স্রেফ কথার কথা বলছেন।'

'না, মামুন। ডাক্তাররা আজকাল অসম্ভবকে সম্ভব করছে। মেডিকেল আর সার্জিকাল টেকনিকও সত্যি খুব দ্রুত উন্নত হচ্ছে। ইরাকের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধে আহত হয়েছিল এমন কয়েকজনকে দেখেছি আমি। তাদের বাঁচার কথা ছিল না, অথচ দিব্যি বেঁচে আছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যারা আহত হয়েছিল, তাদেরও অনেকের বাঁচার কথা ছিল না, কিন্তু আজও তারা মরেনি।'

'আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন···আমি চাই আপনি কাজটা করবেন।'

প্রায় এক মিনিট দু'জনের কেউ আর কিছু বলল না, অপলক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'তোমাকে আমি একটা কথা দিতে পারি। আমরা লাস ভেগাসে চলে যাব। তিন মাস ওখানে থাকবে তুমি। নব্বুই দিন পার হবার পরও যদি তুমি চাও কাজটা আমি করি, বেশ, আমি একটা অ্যাক্সিডেন্টের ব্যবস্থা করব।' প্রিয় কোন ব্যক্তিকে এই প্রথম মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিল রানা। ওর ধারণা, তিন মাস পর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে উঠবে মামুনের।

আবার দীর্ঘক্ষণ কেউ কথা বলছে না। তারপর মামুন জানতে চাইল, 'সত্যি? তিন মাস?'

'হ্যাঁ।'

'গুনে গুনে নব্বুই দিন, একদিনও বেশি নয়?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি প্রতিজ্ঞা করছেন?'

'হ্যাঁ।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মামুন, চাপ দিল রানার হাতে। 'ঠিক আছে, তাহলে সেই কথাই রইল।'

ট্রাইবাল প্রিন্সেস-এ রাত আটটায় ফিরল রানা। হোটেলটা পাহাড়ের ঢালে, হসপিটাল থেকে খুব একটা দূরে নয়। রিসেপশনিস্ট ওর কামরার চাবি আর তিনটে মেসেজ দিল ওকে। একটা মেসেজ মিসেস ভ্যান্সের–তিনি জানিয়েছেন, ডেপুটি পুলিস কমিশনার ইন্সপেক্টর টিকোলোকে নিয়ে তাঁর স্যুইটে অপেক্ষা করছেন। দ্বিতীয়টা ইন্সপেক্টর টিকোলোর, তাতেও ওই একই কথা বলা হয়েছে। শেষটা নড্‌বেলের–রানার অপেক্ষায় বার-এ বসে আছে সে।

বারে এসে রানা দেখল হুইস্কির গ্লাসে একদৃষ্টে তাকিয়ে মূর্তির মত বসে আছে নড্‌বেল। পাশের টুলটায় বসে ইঙ্গিতে বারটেন্ডারকে বিরক্ত করতে নিষেধ করল ও। 'কেমন দেখলে?' গ্লাস থেকে চোখ না তুলেই জানতে চাইল নড্‌বেল।

'খারাপ, খুব খারাপ। আমার হাতে মরতে চায়।'

'ওহ্ গড!'

'ওকে আমি তিন মাস লাস ভেগাসে থাকার কথা বলেছি। তারপরও যদি সিদ্ধান্ত না পাল্টায়, কথা দিয়েছি কাজটা করব।'

'সত্যি করবে?'

'তিন মাস পর ওই বলবে, বাঁচতে চায়। এ-সব ক্ষেত্রে কি হয় তুমি জানো।'

'হ্যাঁ। সময় পেলে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। ভাগ্য বেচারাকে এতটুকু দয়া করেনি। ডান বা বাম দিকে কয়েক মিলিমিটার দূরে লাগলে দু'হপ্তার মধ্যে হেঁটে-চলে বেড়াত।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নড্‌বেল। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি তুমি।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

'মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।'

'আর কিছু করার ছিল?' মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নড্‌বেল জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি অবস্থা?'

'এ-সব আমি অনেক দেখেছি।'

'তা বটে। এ-সব দেখে আমরা অভ্যস্ত।'

রানা বলল, 'এখানে বসে না থেকে এবার তোমার ঘুমাতে যাওয়া দরকার।'

মাথা নাড়ল নড্‌বেল। 'জন বুকানি মিসেস ভ্যান্সের স্যুইটে অপেক্ষা করছেন। ওরা তোমাকে এক ঘণ্টার আগে ছাড়বেন না। তুমি নিজের কামরায় ঢোকার পর শুতে যাব আমি।'

'মিসেস ভ্যান্সকে কেমন দেখলে?'

'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। মামুনের এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।'

'কেঁদে ফেললেন? মিসেস ভ্যান্স?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা, নিজেকে দায়ী বলে ভাবছেন।'

'কেন?'

'তা জানি না। গোটা ব্যাপারটা তিনিই শুরু করেন, হয়তো সেজন্যে।'

'ওনার তো খুশি হবার কথা। উনি যা চেয়েছিলেন আমরা তাই করেছি। খুনীরা মারা গেছে।'

'যাও, দেখলে বুঝতে পারবে,' বলল নড্‌বেল। 'উনি মামুনের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না।'

'তুমিও আমার সঙ্গে এসো,' টুল ছাড়ল রানা।

মিসেস ভ্যান্সের স্যুইটে নক করল রানা, দরজা খুলে দিলেন ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি। রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় ওখানে দাঁড়িয়েই ভদ্রলোক বললেন, 'মি. মামুন আহত হয়েছেন শুনে নিজেই চলে এলাম। সত্যি আমি মর্মাহত, মি. রানা। এ আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি, বিলিভ ইট অর নট। মামুন হারারেতে রানা এজেন্সির দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অপরাধের সংখ্যা শতকরা বিশ ভাগ কমে গেছে। এখানে পৌঁছে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। এখন আপনি বলুন, আমার যদি কিছু করার থাকে...'

'ওকে নিয়ে এখন আর কারুরই কিছু করার নেই, মি. বুকানি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনি আমাকে বিঙ্গা সম্পর্কে শেষ কি খবর জানেন বলুন।'

পুলিস ও রানা এজেন্সির তরফ থেকে দুটো আলাদা রিপোর্ট এসেছে ডেপুটি কমিশনারের হাতে। ক্লিফোর্ড হেগেলের বাড়ির মোজাইক করা মেঝের নিচে চোরা কুঠরি পাওয়া গেছে, সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সাত টন গণ্ডারের শিং–ঠিক শিং নয়, শিং গুঁড়ো করা পাউডার। আরও পাওয়া গেছে হাতির দাঁত, তিনশো বাহাত্তর জোড়া। স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা এত বেশি যে গোণার কাজ এখনও শেষ করা সম্ভব হয়নি। চোরা কুঠরিতেও ডলার পাওয়া গেছে, আনুমানিক তিন কোটির মত।

এতসব ফিরিস্তি শুনতে বিরক্ত বোধ করছে রানা, জন বুকানিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সময় বা মানসিকতা, কোনটাই নেই, কাজেই থানা আর কোর্টে ছুটোছুটি করতে পারব না। লিগাল প্রসিডিং এমনভাবে সম্পন্ন করুন, সব কাজ যাতে বুলাওয়েওতে বসেই সারতে পারি।'

'কেসটার সঙ্গে আপনাকে জড়ানোই হয়নি, মি. রানা,' বললেন ডেপুটি কমিশনার। 'মি. লোটন নড্‌বেলকে রানা এজেন্সির এজেন্ট বলা হয়েছে, তাকেই যা একটু সময় দিতে হবে।'

পথ ছেড়ে দিলেন জন বুকানি, পিছনে নড্‌বেলকে নিয়ে সিটিংরুমে ঢুকল রানা। মিসেস ভ্যান্স তাঁর হুইলচেয়ারে বসে আছেন। ইন্সপেক্টর টিকোলো বসেছে একটা সেটিতে। মিসেস ভ্যান্সের দিকে তাকাল রানা। ভদ্রমহিলার বয়েস যেন হঠাৎ করে দশ বছর বেড়ে গেছে।

রানাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছে ও?'

'কোমর থেকে নিচের দিকটা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড, কাজেই কেমন আছে আমার চেয়ে আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলল?'

'হ্যাঁ।'

'কথাটা তাকে বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি প্রতিক্রিয়া হলো?'

'মামুন শক্ত ছেলে। আমি জানতাম ও কাঁদবে না।'

গলার ঝাঁঝ বা কর্তৃত্বের সুর অনুপস্থিত, মিসেস ভ্যান্স বললেন, 'আমি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার সেরা স্পেশালিস্টদের আনাতে পারি এখানে। আমাদের প্রেসিডেন্ট যে চিকিৎসা পেতে পারেন, মামুনের জন্যে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।'

রানা মাথা নাড়ল। 'মিসেস ভ্যান্স, জাদুর লাঠি ঘোরাবার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এ-সব কেসে এখানকার ডাক্তাররা অত্যন্ত অভিজ্ঞ।'

মাথা তুলে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকলেন মিসেস ভ্যান্স, তারপর অনেকটা বোকার মত জানতে চাইলেন, 'এখন তাহলে আমার করণীয় কি?'

'কিছু করতে চেয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'তবে দুঃখিত, আপনার কিছু করার নেই। আপনি দেশে ফিরে যান।'

'কিছু করার নেই? দেশে ফিরে যাব?' হতভম্ব দেখাল মিসেস ভ্যান্সকে। 'তা কি করে হয়! ছেলেটা আমার কাজ করতে গিয়ে চিরকালের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল, আর তুমি বলছ আমার কিছু করার নেই?'

'আপনিই তাহলে বলুন কি করার থাকতে পারে।'

'কেন, মামুনকে আমি আমার ব্যবসার একজন ডিরেক্টর বানাতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ভ্যান্স। 'আমেরিকায় ওকে আমি একটা বিশাল বাড়ি কিনে দিতে পারি না? ও যদি নিজে একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম খুলতে চায়, আমি ওকে পুঁজি দিতে পারি না? আমি চাইলেই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে...'

তাঁকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এ-সব সাহায্য মামুন নেবে কিনা সেটা ভেবে দেখেছেন? কিংবা নেয়ার দরকার হবে কিনা?'

'তুমি বলতে চাইছ দরকারই হবে না?'

'রানা এজেন্সি থেকে যথেষ্ট টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবে সে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, বীমার টাকা তো আছেই। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ও তো ওর কম নয়।'

'তাহলে...ঠিক আছে, আমি নিজে মামুনের সঙ্গে কথা বলব।'

'কেন?'

'এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না, রানা। একটু আগেই তুমি বলেছ, ওর অবস্থা আর সবার চেয়ে আমিই ভাল বুঝব। কথাটা সত্যি। আমার কথা ও হয়তো শুনবে। আমি হয়তো সত্যি ওকে সাহায্য করতে পারব।'

অস্বস্তিবোধ করছে রানা। তবে উপলব্ধি করল, দেখা করতে না দিলে মিসেস ভ্যান্সের ওপর অবিচার করা হবে। তাঁর শোক আর সহানুভূতির মধ্যে কোন খাদ নেই। 'ঠিক আছে, কাল সকালে আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন। তবে কান্নাকাটি বা কোন সিন ক্রিয়েট করবেন না, প্লীজ।'

শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল, হুইলচেয়ারের হাতল দুটো দু'হাতে চেপে ধরলেন মিসেস ভ্যান্স। 'এ-সব আমাকে শেখাতে হবে না।'

ঘুম ভাঙার পর মামুন দেখল জানালা দিয়ে রোদ ঢুকেছে কেবিনে। ঘুমের ট্যাবলেট কোন কাজে আসেনি, প্রায় সারারাতই জেগে ছিল সে। ভোরের দিকে যা-ও বা ঘুমিয়েছে, দু'তিন ঘণ্টা পর সেটাও ভেঙে গেল। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে নার্সকে দেখতে পেল। এ-ও একজন নান, তবে শ্বেতাঙ্গিনী। টুলে বসে একটা বই পড়ছে।

'কি পড়ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল মামুন।

ঝাঁকি খেয়ে মুখ তুলল নার্স। মেয়েটা পরীর মত সুন্দর, মাথার কালো লম্বা চুল সাদা ফিতে দিয়ে বাঁধা। 'এখন আপনার কেমন লাগছে?'

'খারাপ না। কি পড়ছেন আপনি?'

একটু যেন লজ্জা পেল নার্স। 'রোমান্টিক উপন্যাস। নানদের পড়া নিষেধ কিনা জানি না, তবে পড়তে ভালই লাগে।' বইটা নামিয়ে রাখল সে। এগিয়ে এসে মামুনের পালস দেখল, টেমপারেচার মাপল, একটা ক্লিপবোর্ডে লিখে রাখল সব। 'ডাক্তার আসবেন এক ঘণ্টা পর,' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে চীফ মেট্রনকে জানাল মামুনের অবস্থা আগের মতই, কোন পরিবর্তন নেই।

'বই পড়তে আমিও ভালবাসি,' বলল মামুন। 'আপনাদের এখানে বেশ ক'টা দিন থাকতে হবে আমাকে...হাসপাতালে কি কোন লাইব্রেরী আছে?'

'হ্যাঁ, বেশ বড় একটা লাইব্রেরী আছে। সকালে আর সন্ধ্যায় প্রতি ওয়ার্ডেই বই পাঠানো হয়।'

'সকালে কোন্ সময়?'

'দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নার্স বলল, 'সাড়ে সাতটা।'

বালিশে মাথা ঘুরিয়ে বেডসাইড টেবিলটার দিকে তাকাল মামুন। ওটায় একটা জাগ আর গ্লাস রয়েছে। 'আমাকে একটু পানি খাওয়াবেন?'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খানিকটা পানি ঢালল নার্স, নরম হাত রাখল মামুনের ঘাড়ের পিছনে, গ্লাসটা ধরল তার ঠোঁটের ওপর। কাঁধে যেন কেউ ছুরি চালাল, তবে মামুন কোন শব্দ করল না। এক ঢোক পানি খেয়ে বালিশে মাথা নামাল, বন্ধ করল চোখের পাতা। টুলে ফিরে এসে বসল নার্স, বইটা হাতে নিল আবার।

খানিক পর চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মামুন। ছয় তলায় রয়েছে সে, আকাশ ছাড়া বিছানা থেকে দেখার কিছু নেই। পাঁচ মিনিট পার হলো। ঘাড় ফিরিয়ে নার্সের দিকে তাকাল সে। 'আপনার নাম কি, সিস্টার?'

নার্স হাসল। গোল মুখ, কমনীয় চেহারা; চোখ দুটো সরল, চেহারায় পবিত্র ভাব। 'সিন্থিয়া।'

মামুনও হাসল। 'খুব সুন্দর নাম। সিন্থিয়া, আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। বলুন কি করতে হবে।'

অক্ষত হাতটা তুলে বইটা দেখাল মামুন। 'আমার আর ঘুম আসবে না, মনটাকে শান্ত রাখার জন্যে একটা কিছু পেলে ভাল হত। আপনি কি লাইব্রেরীতে গিয়ে আমার জন্যে একটা বই আনতে পারেন? একটা বা দুটো?'

চিন্তা করছে নার্স। একবার হাতঘড়ি দেখল। 'না পারার কি আছে। করিডরের শেষ মাথাতেই লাইব্রেরী। কি ধরনের বই পছন্দ করেন আপনি?'

'দুটো নয়, চার-পাঁচটা নিয়ে আসবেন। ওয়েস্টার্ন আর ডিটেকটিভ গল্প পছন্দ করি আমি, কিংবা ভাল থ্রিলার।'

হাতের বইটা রেখে দিয়ে দাঁড়াল সিন্থিয়া। 'আপনাকে একা রেখে কোথাও যাওয়া আমার উচিত নয়, তবে ফিরে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।' মামুনের মাথার পিছনে একটা কর্ড ঝুলছে, কর্ডের শেষ মাথায় একটা বোতাম, ইঙ্গিতে সেটা দেখাল সে। 'শরীর খারাপ লাগলে ওই বোতামটায় চাপ দেবেন।'

'চিন্তা করবেন না, সিস্টার সিন্থিয়া। আমি ভাল আছি। হাতে ভাল একটা বই পেলে আজেবাজে চিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে আনতে পারব।'

করিডরে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলে দিল নার্স। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল মামুন। এক চুল নড়ল না, ঝাড়া দু'মিনিট নিঃসাড় পড়ে থাকল। তারপর চোখ মেলল সে, ডান হাত দিয়ে গা থেকে চাদরটা সরাল। মাথা সামান্য উঁচু করে অকেজো পায়ের পাতার দিকে তাকাল একবার। তার পরনে এক প্রস্থ সাদা কাপড় জড়ানো, পিছন দিকে আলগা করে বাঁধা। কাপড়টা খানিক টেনে পা দুটো উন্মুক্ত করল সে। ওগুলোর পাশে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। কাগজটা তুলে টেবিলের ওপর রাখল, জাগের পাশে গ্লাস চাপা দিয়ে। তারপর বিছানা থেকে গড়িয়ে ঝুপ করে পড়ল মেঝেতে।

মেঝেতে নামার পর দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড গোঙাল মামুন। তারপর আরেকটা গড়ান দিয়ে উপুড় হলো। অক্ষত কাঁধটা মেঝেতে রেখে ক্রল করছে, প্রতিবার এক ইঞ্চির বেশি এগোতে পারছে না। বাম কাঁধে যেন আগুন ধরে গেছে, তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে সে। মনে হলো অনন্তকাল ধরে ঘটছে ব্যাপারটা, তবে এক সময় পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ডান হাত তুলে জানালার কিনারা ধরল। নিয়মিত ব্যায়াম করায় হাতের পেশীতে যথেষ্ট শক্তি আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীরটাকে উঁচু করার জন্যে ডান কনুইয়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হলো। জানালার কিনারা

পর্যন্ত তুলতে পারল বুক. অসাড় পা দুটো খানিকটা ঝুলছে. খানিকটা মেঝেতে পড়ে আছে। মামুন ভয় পেল, ব্যথায় না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আরও একটু মাথা তোলার পর বাইরে তাকাল সে। ওর সামনে সযত্নে সাজানো একটা পার্ক–সারি সারি গাছ. খোলা লন, কেয়ারি-করা ফুলবাগান। জানালার চৌকাঠে আরও খানিক তুলে আনল শরীরটা, তারপর নিচে তাকাল। হাসপাতালের প্রাইভেট কেবিনগুলো সবই টপ ফ্লোরে, ছয়তলায়। তার সরাসরি নিচে কংক্রিটের চওড়া রাস্তা। নিচে তাকিয়ে আছে, মহাকাল থেকে আরও একটা মিনিট বেরিয়ে গেল। মাতৃভাষায় বিড়বিড় করল মামুন, পাশে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও শুনতে পেত না কি বলল। তারপর কাঁধের ব্যথাটাকে দাঁতে দাঁত চেপে অগ্রাহ্য করে, জানালার কিনারা থেকে খসে পড়ল নিচে।

করিডরে হুইলচেয়ার ঠেলছে সিলভিয়া, চোখ বুলাচ্ছে কেবিন নম্বরে। তবে মিসেস ভ্যান্সই প্রথম দেখতে পেয়ে হাত তুললেন। 'ওই তো, তিন নম্বর।'

দরজায় নক করল সিলভিয়া। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

মিসেস ভ্যান্স বললেন, 'চীফ মেট্রন বলেছেন ও জেগে আছে। চলো ভেতরে ঢুকি।'

হাতল ঘুরিয়ে কবাট ফাঁক করল সিলভিয়া, তারপর হুইলচেয়ারের পিছনে ফিরে এল, মিসেস ভ্যান্সকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনে। বিছানা খালি।

জানালা দিয়ে লোকজনের চিৎকার ভেসে আসছে। হুইলচেয়ার ছেড়ে সেদিকে ছুটল সিলভিয়া। নিচে তাকিয়ে সাদা কাপড়ে জড়ানো আকৃতিটা দেখল, লোকজন সেটার ওপর ঝুঁকে আছে, একসঙ্গে চিৎকার করছে সবাই। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড!' মুখে একটা হাত, ঘুরে মিসেস ভ্যান্সের দিকে তাকাল সে।

মিসেস ভ্যান্সের হুইলচেয়ার বিছানার পাশে। হাতে একটা কাগজ, পড়ছেন তিনি। আঙুল থেকে কাগজটা খসে পড়ল। তারপর হাত দুটো তুলে মুখ ঢাকলেন।

জানালার কাছ থেকে হেঁটে এল সিলভিয়া, ঝুঁকে মেঝে থেকে কাগজটা তুলল। কানে কান্নার শব্দ, চিরকুটটা পড়ছে।

'মি. জন বুকানি ও মাসুদ ভাইকে,

নানকে দায়ী করবেন না। জানি তাকে আমার কৌশলে সরিয়ে দিতে হবে। মাসুদ ভাই. আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু জীবনে সম্ভবত এই একটা কথাই আপনি রাখতে পারবেন না। যে নতুন জীবন দান করে, সে কখনও মরার অনুমতি দেয় না–কি করে ভুলি আপনিই আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন। সমস্যা হলো, তিন মাস পর আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাব না। পরিচয় হবার পর থেকে হুইলচেয়ারে বসা ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করছি আমি–নিজের যন্ত্রণা একা ভোগ করতে রাজি নন, সবাইকে অতিষ্ঠ করে রেখেছেন। খুব অল্পদিন বাঁচলাম, তবে আপনার কল্যাণে সেগুলো খুব উপভোগ্য আর রোমাঞ্চকর ছিল। মাসুদ ভাই, দুঃখ

কেবল একটাই, আপনার ঋণ শোধ করা হলো না। আম্মাকে বলবেন, আমার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। আরেকটা কথা, আমাকে যেন দেশে কবর দেয়া হয়। মামুন।'

খাকি ট্রাউজার আর ছাই রঙের শার্ট পরেছে। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। ল্যান্ড-রোভার থেকে নেমে দু'ঘণ্টা হাঁটল। মাতোপোস-এর দক্ষিণ প্রান্তের দিকে যাচ্ছে, বুলাওয়েওর দক্ষিণে ছোট্ট একটা অভয়ারণ্য। সাধারণত উত্তর দিকেই ভিড় করে ট্যুরিস্টরা, সেখান থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এদিকে কোন রাস্তা বা মানুষের তৈরি ট্রেইল নেই। স্রেফ আদিম আফ্রিকার প্রকৃতি, সভ্যতার হাত এখনও কলঙ্কিত করেনি, কোন হুমকি ছাড়াই স্বাধীনভাবে বসবাস করছে বন্য প্রাণীকুল।

কুডু, ইম্পালা আর জেব্রার পালকে পাশ কাটিয়ে এল। দূরে কয়েকটা বাফেলো দেখল, ওগুলোকে এড়াবার জন্যে ঘুরপথে এগোতে হলো। বন্য কুকুর, শুয়োর আর হায়েনাও আছে—একটার দিকেও সরাসরি তাকাল না বা কাছাকাছি হলো না। এমন ভঙ্গিতে হাঁটছে, যেন চাবি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ-পথে আগেও এসেছে, তবে অনেক বছর আগে।

বনভূমি হালকা হয়ে এল। শুরু হলো ঢেউ খেলানো পাহাড়, ঢাল ও চূড়াগুলো প্রকাণ্ড সব বোল্ডারে ঢাকা। কোন কোন বোল্ডার আকারে বাড়ির সমান। কোথাও দেখা গেল কিভাবে যেন একটার ওপর আরেকটা চড়ে বসেছে; কিন্তু পড়ে না যাবার দৃশ্যত কোন কারণ নেই, অথচ পড়ছে না। বাম দিকে গেল না, ওদিকে শ্বেতাঙ্গদের কবরস্থান আছে—কালোদের স্বাধীনতা দিতে রাজি হয়নি তারা।

সূর্য ডোবার ঠিক আগে ছোট একটা লেকের সামনে পৌঁছল। একা আসার পথে কয়েকবারই থামতে হয়েছে, কান পেতে অপেক্ষা করেছে কোন শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে। দৃঢ় একটা বিশ্বাস জন্মেছে মনে, সে ছাড়া কয়েক মাইলের মধ্যে অন্য কোন মানুষ নেই। প্রকৃতির নিজের তৈরি শব্দে বৈচিত্র্য, ছন্দ, চমক আর সুর আছে, তা কেবল তার দ্বারাই মাঝে-মধ্যে বিঘ্নিত হয়েছে, তবে তা অতি নগণ্য। সে যখন হেঁটে আসছিল, ভাব বা আচরণ দেখে মনে হয়েছে বণ্য প্রাণীরা তাকে যেন নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছে। লেকের কাছাকাছি সমতল একটা জায়গা বাছল সে, নিঃসঙ্গ এক মোপানি গাছের তলায়। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে আশপাশ থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনল। তার চারপাশ থেকে ঢাল বেয়ে নিচের লেকে নামছে পশুর পাল, রাত নামার আগে শেষবার পানি খাবে—প্রাণচঞ্চল ইম্পালা, সাবধানী কুডু, কোমর ভাঙা তালগাছের মত জিরাফ। মিছিলটায় শৃঙ্খলা আছে। প্রত্যেকেই যেন জানে মিছিলে কে কোথায় থাকবে, হাঁটার গতি কি হবে, কখন এক পাশে সরে গিয়ে পথ ছাড়তে হবে অন্যকে। ঘণ্টাখানেক আগে একদল সিংহকে দেখেছে সে, সদ্য শিকার করা একটা হরিণের মাংস খাচ্ছে। মাতাপোস-এ খুব বেশি সিংহ নেই, যে-ক'টা আছে অন্য প্রাণীরা সেগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। এরইমধ্যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, বাকি সব প্রাণীরা বুঝে নিয়েছে

আগামী কয়েকটা দিন নিরাপদে থাকবে তারা–কারণ, খিদে না পেলে সিংহ শিকার ধরে না।

সূর্য ডোবার পর আগুন জ্বালল সে। পিছনে, কাছাকাছি, শুকনো কাঠের একটা স্তূপ তৈরি করেছে, আগুনটা যাতে সারারাত জ্বালিয়ে রাখতে পারে। একটা লগ টেনে এনে সেটার ওপর বসল। ট্রাউজারের ব্যাক পকেট থেকে একটা হিপ ফ্লাস্ক বের করল। আরেক ব্যাক পকেট থেকে বের করল শুকনো মাংসের একটা ফালি। পশুরা যখন ফিরে যাচ্ছে, মুখে মাংস পুরে চিবাল, ঠোঁটে হিপ ফ্লাস্ক তুলে মদ খেলো মাঝে-মধ্যে।

গোধূলির নিস্তব্ধতা একটু একটু করে ভাঙছে, সন্ধ্যার বিচিত্র শব্দগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আশপাশের গাছে রাতের মত আশ্রয় নিয়েছে পাখিরা, আরাম করে শোয়া-বসার কাজে ব্যস্ত, নিজেদের মধ্যে কিচিরমিচির করছে। অগণিত পোকামাকড়ের ডাক, যৌনমিলনে মত্ত একজোড়া বন্য শূকরের গোঙানি। দূর থেকে ভেসে আসা একটা হায়েনার বিদ্রূপাত্মক, কর্কশ হাসি। আরও দূরে একটা সিংহের কাশি, তা-ও গর্জনের মত শোনাল। খুদে, কালো আকৃতি, আগুনের মাথার ওপর দ্রুত ডানা ঝাপটে উড়ছে–বাদুড়, আলোর আকর্ষণে ছুটে আসা পোকা ধরে খাচ্ছে।

প্রিয়জনকে হারানোর গভীর বেদনা অসুস্থ করে তুলেছে রানাকে। গোটা অস্তিত্ব জুড়ে তীব্র একটা কষ্ট। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায় ও। লোকজনের সামনে আবেগ চেপে রেখে নিজের সহ্যক্ষমতা বা মনের জোর দেখানো তেমন কঠিন কাজ নয়। এতটা পথ হেঁটে মাতোপোস-এ এসেছে যাকে ও বোঝে না সেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মনে কত প্রশ্ন জাগছে, সেগুলোয় ক্ষোভ আর অভিযোগ এত বেশি যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সব প্রশ্নই তাঁর কাছে, যিনি তার জীবন নয়, কেড়ে নিলেন মামুনের জীবন। নিঃশেষ প্রায় আলোয় চারদিকে তাকিয়ে ভাবল, ঈশ্বর এত সুন্দর স্বর্গ বানালেন, অথচ তারপরও, প্রায়ই, প্রাপ্য নয় এমন মৃত্যু ও কষ্টভোগ সমর্থন করেন কিভাবে! সারাটা জীবন এই হেঁয়ালি চাক্ষুষ করে আসছে সে।

আজ এখানে, এই মাতোপোস-এ, রানার মনে হলো, এ-সবে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা থাকে না। ভূমিকা রাখে শুধু প্রকৃতি। প্রকৃতির বিধান একটা নিয়মে বাঁধা। প্রাণীকুল সেই নিয়মের বলি মাত্র। কেউ আঙুল তুলে কাউকে দেখিয়ে দিচ্ছে না। চিতা হরিণ শিকার করছে ইন্সটিঙ্কটবশত, পূর্ব-পরিকল্পনা বা আক্রোশ বলে কিছু নেই। ব্যাপারটা তার কাছে শুধুই পেটপূজা।

সিংহরা এল আরও প্রায় দু'ঘণ্টা পর। মোট চারটে, তিনটে মেয়ে, কালো কেশর নিয়ে একটা পুরুষ। পুরুষটাকে চিনতে পারল রানা, আসার পথে তাকে শিকার করা হরিণের মাংস খেতে দেখেছে–তার ভোজন শেষ হবার অপেক্ষায় মেয়েরা একপাশে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওরা এসেছে স্রেফ কৌতূহলবশত। পেট তো ভরাই। ধীর পায়ে এত কাছে চলে এল, যাতে আগুনের আঁচ পায়। ধীর পায়ে এলেও, হাবভাবে ভয়ের লেশমাত্র

নেই। জমিনে পেট ঠেকাল, আগুনের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। রানাও তাকিয়ে থাকল। মাঝখানে মাত্র বিশ মিটার দূরত্ব। আগুনটা কমে আসছে। পিছনে হাত বাড়িয়ে শুকনো ক'টা কাঠ ধরল ও, ধীরে-সুস্থে ফেলল আগুনের ওপর। মেয়েদের একজন চিৎ হলো জমিনে, ভেতর থেকে ফুলে থাকা পেট মেলে ধরল আগুনের দিকে, আঁচ পোহাচ্ছে।

পুরুষটা গুড়ি মেরে বসে আছে, উজ্জ্বল হলুদ চোখে দেখছে রানাকে। পরবর্তী এক ঘণ্টায় বাকি মেয়ে দুটোও আগুনের খানিকটা কাছে সরে এসে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পুরুষটা নড়াচড়া করছে না, বাতাস লাগায় শুধু মাঝে মধ্যে ঢেউ উঠছে কালো কেশরে। রানাও স্থির; তবে কিছুক্ষণ পরপর পিছন থেকে কাঠ নিয়ে আগুনটার ওপর ফেলছে। আরও এক ঘণ্টা পার হলো, ওর মনের গহীনে নিজের সঙ্গে তর্ক আর বোঝাপড়া চলছে। আরও এক ফালি মাংস চিবাতে শুরু করল, মদ খেলো আরও দু'ঢোক। মাঝে-মধ্যে সশব্দে ঢেকুর তুলল সিংহটা। অবশেষে, শান্ত ভঙ্গিতে লগ থেকে নামল রানা, ফ্লাস্কের বাকি তরলটুকু শেষ করল কয়েক চুমুকে। তারপর মাটিতে শুয়ে চোখ বুজল। আধো ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলতে দেখল, সিংহটাও মাটিতে মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করেছে।

রাতের আওয়াজ পরিবেশটাকে শান্ত বা নিস্তব্ধ হতে দিল না। তবে তাতে করে ওদের ঘুমে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো না। ভোর হবার ঠিক আগে নতুন একটা আওয়াজ যোগ হলো। হায়েনার কর্কশ কাশি, কুৎসিত হাসির মত লাগল সদ্য জেগে ওঠা রানার কানে। শব্দটা ওর পিছন থেকে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে না, তবু জোর করে চোখ খুলল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার আগেই লক্ষ করল রানা, সিংহটা মাটি থেকে মাথা তুলেছে, তাকিয়ে আছে আগুন আর ওর পিছনে। তারপর চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ওটা, আগুনটাকে ঘুরে হেঁটে এল, স্থির হলো ওর আড়ষ্ট শরীর থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। সামনে তাকিয়ে আছে সিংহ, অন্ধকারে চোখ। তারপর শ্বাস নিয়ে একটা গর্জন ছাড়ল। এই গর্জন সহস্র বছর ধরে আফ্রিকার হৃদয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

পিছু হটার ত্রস্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। আগুনের উল্টোদিকে সিংহীরাও মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শোনার পর আবার তারা কাত হয়ে চোখ বুজল। আগুনটাকে ঘুরে নিজের জায়গায় ফিরে এল সিংহ, বসল আবার। আগুন প্রায় নিভে গেছে। রানা আর তাতে কাঠ গুঁজল না। ওর ডান দিকে রাঙা হতে শুরু করেছে পুব দিগন্ত। সিধে হলো ও, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর মাটি ফেলে নেভাতে শুরু করল আগুনটা। এবার ওকে ফিরতে হবে। দু'ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছুতে হবে ল্যান্ড-রোভারের কাছে।

রওনা হবার পর, মাত্র একশো গজ এগিয়ে, থামল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। সিংহীরা এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। একা শুধু সিংহ জেগে। রওনা হবার সময় ও দেখেছে, বসে ছিল; এখন দাঁড়িয়ে আছে, সরাসরি ওর দিকে

তাকিয়ে।

হাত নেড়ে বিদায় সঙ্কেত জানাল ওকে রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার নিজের পথ ধরল।

রানা জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সদ্য নেভা আগুনের কাছ থেকে দেড়শো মিটার দূরে কয়েকটা বোল্ডারের ভেতর সিধে হলো ঘন কৃষ্ণবর্ণ একটা ছায়ামূর্তি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম লোটন নড্‌বেল তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ অন করল। তারপর, অত্যন্ত সাবধানে অনুসরণ করল তার প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে।

***